মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর
T
156
BANIPUR

মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগর

এক

গ্রামের নাম বীরসিংহ। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। এই স্থানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার (ইংরেজী ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ) দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই জনক জননীর প্রথম সন্তান। বিদ্যাসাগরের পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জননীর নাম ভগবতী দেবী। এই ক্ষুদ্র পরিবার দরিদ্র হইলে কি হয়, এই পরিবারে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণজনোচিত সদনুষ্ঠান সকলের অভাব ছিল না। যে যে আচার আচরণ ও ক্রিয়া-কলাপ সন্দর্শনে বালক-বালিকা সুশিক্ষা লাভ করিয়া উত্তরকালে গৌরবময় জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃগৃহে সে সকলের আয়োজনই ছিল।

বীরসিংহ গ্রামের বন, উপবন, ধান্যক্ষেত্র, জলাশয় ও অপরাপর নৈসর্গিক শোভা ঈশ্বরচন্দ্রের শৈশব-স্মৃতি অধিকার করিয়াছিল সত্য, বাল্যকালের ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ-প্রমোদ, বাল্যকলহ, বাল্যসৌহার্দ্দ্য,—এই সকলই বীরসিংহের ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ থাকিলেও, বীরসিংহ তাঁহার অতি প্রিয় স্থান হইলেও ইহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসভূমি নহে। হুগলী

জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে বনমালীপুর নামে একটি গ্রাম আছে, উহাই ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থান। জ্ঞাতি বিরোধে বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ বনমালীপুরের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া বীরসিংহ গ্রামে আসিয়া বাসস্থাপন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস গৃহে ছিলেন না। নিকটবর্ত্তী কোমরগঞ্জ নামক স্থানে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ পুত্রকে এই শুভসমাচার দিবার জন্য হাটের দিকে ছুটিলেন। পথেই পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হইল। রামজয় ঠাকুরদাসকে বলিলেন, "একটা এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।" সেই সময়ে তাঁহাদের গৃহে একটি আসন্ন-প্রসবা গাভীও ছিল। ঠাকুরদাস গৃহে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে গোবৎস দেখিবার জন্য গোশালার দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, রামজয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ওদিকে নয়, এইদিকে আইস, আমি তোমাকে এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি।"—এই বলিয়া তিনি সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং শিশুকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাকে 'এঁড়ে বাছুর' বলিবার কারণ এই যে, এই বালক এঁড়ে বাছুরের মত একগুঁয়ে হইবে, যাহা ধরিবে, তাহাই করিবে, কাহাকেও ভয় করিবে না। এই বালক ক্ষণজন্মা, প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন ও পরম দয়ালু হইবে। ইহার যশোগীতিতে চারিদিকে পূর্ণ হইবে, ইহার জন্মগ্রহণে আমার বংশের অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ হইল। এই জন্য ইহার নাম রাখিলাম, ঈশ্বরচন্দ্র।"

বিদ্যাসাগর যখন জননী-গর্ভে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জননী উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছিলেন। নানাপ্রকার ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়াও তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই প্রসূতি আরোগ্যলাভ করিলেন, তাঁহার পূর্ব্বজ্ঞান, পূর্ব্বভাব সমস্তই ফিরিয়া আসিল। তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

একজন জ্যোতিষী এই আসন্নপ্রসবা বধূর কোষ্ঠী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বধূর কোনও পীড়া হয় নাই, তিনি সুস্থ শরীরে নিরাপদে কালাতিপাত করিতেছেন। ঈশ্বরানুগৃহীত কোনও মহাপুরুষ ইহার গর্ভে স্থান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই তেজঃ প্রভাবে প্রসূতি অধীরা হইয়া পড়িয়াছেন। এই শক্তিশালী শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই প্রসূতি সুস্থ হইবেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ তীর্থপর্য্যটনকারী রামজয় তর্কভূষণ এক সময়ে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশে এক শক্তিশালী মহাপুরুষের আগমন হইবে, সেই শিশু উত্তরকালে বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে, তাহার কার্য্যকলাপে দেশের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে, সে দয়ার অবতার হইয়া তাঁহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সিদ্ধপুরুষ রামজয় তর্কভূষণ শিশুর জিহ্বার তলে আলতা দিয়া কিছু লিখিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই শিশু উত্তরকালে, সকলকে পরাজয় করিবে, ইহার দয়াদাক্ষিণ্যে সকলে মুগ্ধ হইবে। আমিই ইহার দীক্ষা গুরু হইলাম, এই বালক আর অন্য গুরু গ্রহণ করিবে না, আমার স্বপ্নদর্শন আজ সফল হইল, আমার বংশ পবিত্র হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগর অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের জন্মের পূর্ব্বে এই পরিবারের দশা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল ; এমন কি, প্রতিদিন দুই বেলা আহার পর্য্যন্ত জুটিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা ঠাকুরদাস সাংসারিক দারিদ্র্যের তাড়নায় অস্থির হইয়া অর্থোপার্জ্জনের আশায় কলিকাতায় আগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চদশ বৎসর। কলিকাতায় আসিয়া তিনি তাঁহার জ্ঞাতি-পুত্র জগন্মোহন ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের গৃহে স্থান লাভ করিলেন। তিনি ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে যথারীতি সংস্কৃত শিক্ষা করিবেন, এইরূপ স্থির হইল। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, দীর্ঘকালব্যাপী সংস্কৃত অধ্যয়নে আশু অর্থোপার্জ্জনের আর কোনও আশা নাই, তখন জননীর দুঃখ কষ্ট স্মরণ করিয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। একদিকে বিদ্যাশিক্ষা করিবার প্রবল আকাজ্ক্ষা, অন্যদিকে নিরুপায়া জননীর ও ভাই-ভগিনীগুলির অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য মনের উত্তেজনা, এই উভয়বিধ চিন্তার মধ্যে শেষে শেষেরটিরই জয় হইল। অল্প সময়ের মধ্যে কোনও প্রকার অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জনীর দুঃখ দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ঐ সময়ে মোটামুটি ইংরেজী জানিলে সওদাগর সাহেবদের আফিসে সহজেই চাকুরী পাওয়া যাইত, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ইংরেজী শিক্ষা করাই পরামর্শসিদ্ধ ভাবিয়া সকলেই ঠাকুরদাসকে সেইরূপ পরামর্শ দিল। ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের একজন বন্ধু কাজ চালাইবার মত ইংরেজী

জানিতেন, তিনিই ঠাকুরদাসকে ইংরেজী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর তিনি ঠাকুরদাসকে ইংরেজী পড়াইতেন। ঠাকুরদাস তাঁহার বাসায় যাইয়া পড়িতে লাগিলেন।

কিছুদিন ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের গৃহে অবস্থানের পর তাঁহার রাত্রে আহারের অসুবিধা হইতে লাগিল। কাজেই তিনি অন্য একটি গৃহে থাকিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিছুদিন এখানে ভালভাবে কাটিবার পর গৃহস্বামীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ঠাকুরদাসেরও ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল, কোনওদিন আহার জুটিত, কোনওদিন উপবাসে কাটিত।

ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতা এই সময়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়া মাসিক দুই টাকা বেতনে ঠাকুরদাসের একটি কার্য্য জুটাইয়া দিলেন। এই দুই টাকা বেতনে ঠাকুরদাসের আনন্দের আর সীমা রহিল না। পূর্ব্বের ন্যায় আশ্রয়দাতার বাসায় থাকিয়া দুইটি টাকাই বাড়ীতে পাঠাইতে লাগিলেন। ঠাকুরদাসের যখন এই চাকরী হয় তখন তাঁহার পিতার গৃহে আনন্দোৎসব হইয়াছিল। দুই তিন বৎসরের মধ্যে ঠাকুরদাস নিজের শ্রমশীলতার গুণে দুই টাকার স্থলে পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। ইহাতে জননী ও ভগিনীগুলির অন্নকষ্টের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হওয়াতে ঠাকুরদাস অধিকতর আগ্রহসহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

দুই টাকা বেতনের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইবারই কথা। তখন আট আনায় দশ আনায় একমণ চাউল পাওয়া যাইত। এক টাকায় একমণ দুধ মিলিত। শাকসব্জী ও তরিতরকারী

প্রায় কিনিতে হইত না। এক প্রকার বিনা টাকায় দিন চলিত। সে সুখের দিন চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। বঙ্গবাসীর ভাগ্যে সেই সুখের দিন আর আসিবে না।

রামজয় তর্কভূষণ মহাশয় পুত্র ঠাকুরদাসের সহিত দেখা করিবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। বড়বাজারে ভাগবতচরণ সিংহ নামে তাঁহার এক পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। রামজয়ের অনুরোধে তিনি ঠাকুরদাসকে স্বীয় গৃহে স্থান দিয়া তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অধিকন্তু ঠাকুরদাসকে মাসিক আট টাকা বেতনে একটি চাকরীও করিয়া দিলেন। এইবার ঠাকুরদাস অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, তাঁহার আহার ও বাসস্থানের ভাবনা দূর হইল। ঠাকুরদাসের বেতন বৃদ্ধির কথা শুনিয়া জননী দুর্গা দেবীর আর আনন্দের সীমা রহিল না।

এই সময়ে ঠাকুরদাসের বয়স ২৩।২৪ বৎসর হইবে। রামজয় তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। গোঘাট নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের বিবাহ হইল। এই ভগবতী দেবীই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী।

দুই

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম গ্রহণের পর হইতে ঠাকুরদাসের সংসারের শ্রীবৃদ্ধির সূচনা হয়, এইজন্য বালককে সকলে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। বালকও সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দুরন্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বাড়ীতে ও প্রতিবাসিগণের গৃহে ভয়ানক দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা দর্শন করিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের পাঠশালায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। পঞ্চম বর্ষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় প্রেরিত হইলেন। এই সময় হইতে আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র এই পাঠশালাতেই বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মেধাশক্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাঠে মনোযোগিতা ও শ্রমপটুতা দর্শনে গুরুমহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুরুমহাশয়ের অতিশয় প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তিন বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

এই আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র স্বীয় বালসুলভ চপলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। গ্রামের কোনও গৃহস্থের দ্বারদেশে মলমূত্র ত্যাগ করা তাঁহার একটি প্রধান কার্য্য ছিল। লোকে কাপড় কাচিয়া রৌদ্রে দিলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে কাঠি দ্বারা বিষ্ঠা লাগাইয়া দিতেন। ধান্য ক্ষেত্রের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে অপক্ক ধানের শীষ তুলিয়া কতক খাইতেন, কতক ফেলিয়া দিতেন। একবার যবের শীষ খাইতে গিয়া যবের শীষ গলায় ফুটায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতামহী গলায়

আঙ্গুল দিয়া বহুকষ্টে তাহা বাহির করিয়া দেন, তবে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পান। এই প্রকার বহু দুরন্তপনার পরিচয় তাঁহার বাল্যজীবনে পাওয়া যায়।

অত্যধিক দূরন্ত হইলেও লেখাপড়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগের ত্রুটি ছিল না। গুরু মহাশয় যাহা কিছু শিক্ষা দিতেন, অত্যন্ত আগ্রহসহকারে অত্যল্প সময়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র তাহা শিক্ষা করিতেন। এইজন্য গুরু মহাশয় অনেক সময় অপরাহ্নে অপরাপর বালকগণকে বিদায় দিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে নিকটে রাখিতেন এবং যে সকল পাঠ মুখে মুখে অভ্যাস করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিতেন। বেশী রাত্রি হইলে, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিজে কোলে করিয়া তাঁহার পিতামহীর নিকট দিয়া আসিতেন। এই সময়ে গুরু মহাশয় একদিন ঠাকুরদাসকে বলিলেন, এখানকার পাঠশালায় যাহা শিক্ষা করা আবশ্যক, ঈশ্বরচন্দ্রের তাহা শেষ হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্রের হাতের লেখা অতি সুন্দর। ইহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া ইংরেজী শিক্ষা দিলে ভাল হয়। এ বালক যেরূপ মেধাবী, ইহার স্মৃতিশক্তি যেরূপ প্রবল, তাহাতে এই বালক যাহা শিখিবে, তাহাতেই যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে।

ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র যে উত্তরকালে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও পণ্ডিতগণের অগ্রণী হইবেন, বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় পথে একটি ঘটনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

শিয়াখালার নিকট সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, বাট্‌না বাটা শিলের মত এক এক খানি পাথর মধ্যে

মধ্যে পথের ধারে বসান রহিয়াছে, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তিনি তাঁহার পিতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুরদাস বলিলেন, "পথের মাইলের চিহ্ন বুঝাইবার জন্য এক এক মাইল দূরে এইরূপ এক একটি পাথর বসান আছে, ইহাকে 'মাইল ষ্টোন' বলে। পাথরের গায়ে ইংরেজী অঙ্কে মাইল লেখা রহিয়াছে। এই পাথরখানিতে ১৯ লেখা রহিয়াছে, কলিকাতা হইতে এই পর্য্যন্ত ১৯ মাইল।" তখন বালক ঈশ্বরচন্দ্র মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, পথে যাইতে যাইতে ইংরেজী অঙ্কগুলি শিখিয়া ফেলিবেন। উনিশ হইতে দশ মাইল পর্য্যন্ত আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমার ইংরেজী অঙ্ক শিক্ষা হইল! আমি এক হইতে দশ পর্য্যন্ত শিখিয়াছি।' ঠাকুরদাস পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ঠিকই হইয়াছে।

১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া পিতার সহিত ভাগবতচরণ সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভাগবতচরণ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র জগদ্দুর্লভ সংসারের কর্ত্তা হইয়াছেন। তিনি ঠাকুরদাসকে খুড়ামহাশয় বলিয়া ডাকিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় আনিবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদাসের দুই টাকা বেতন বৃদ্ধি পাইল। পূর্ব্বে বেতন পাইতেন আট টাকা, এখন বেতন হইল দশ টাকা।

ঠাকুরদাসের কলিকাতার বাসার নিকটেই একটি পাঠশালা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রকে সেই পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। ঈশ্বরচন্দ্র তিন মাস সেই পাঠশালায় পড়াশুনা করিলেন।

বন্ধুবান্ধবেরা ঈশ্বরচন্দ্রকে ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়া ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। কিন্তু ঠাকুরদাসের আন্তরিক ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। বংশের সকলেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া অধ্যাপকমণ্ডলীর শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন, ঠাকুরদাস মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, ইশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বাড়ীতে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামের ও অন্যান্য নানা স্থানের বালক দিগকে সংস্কৃত বিদ্যা দান করিবেন। এই জন্য ঈশ্বরচন্দ্রকে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার পরামর্শ তাঁহার মনঃপুত হইল না। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃমাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পিতৃব্য-পুত্র মধুসূদন বাচস্পতি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারই উৎসাহ ও পরামর্শে ঠাকুরদাস পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ইহা ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন। তখন ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স ছিল নয় বৎসর। ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সংস্কৃত পাঠের সূচনা হয় নাই। কিন্তু বিদ্যালয়ে প্রবেশের দিন হইতে তিনি তাঁহার শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালক হইলেন।

তিন

সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হওয়ার ছয়মাস পরে যে পরীক্ষা হয় ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে পাঁচ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

পিতা ঠাকুরদাস প্রতিদিন বেলা নয়টার সময়ে বড়বাজারের বাসা হইতে ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কলেজে পৌঁছাইয়া দিতেন এবং বেলা চারিটার সময় নিজে যাইয়া বালককে বাসায় লইয়া আসিতেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার উপর স্নেহ সহকারে দৃষ্টি রাখিবার লোক ছিল এবং পিতা নিজে তাঁহাকে পথে যাতায়াতে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন বলিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র অল্প বয়সে মন্দ বালকের সংসর্গ লাভের সুযোগ পান নাই।

ক্রমে ঠাকুরদাস যখন বুঝিতে পারিলেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র একাকী পথে যাইতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং একাকী গেলে কোনও ক্ষতি হইবে না, তখন তাঁহাকে একাকীই যাইতে দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ক্ষুদ্রাবয়বসম্পন্ন ছিলেন। বালক যখন পথে একাকী একটা ছাতা মাথায় দিয়া যাইতেন, তখন দূর হইতে দেখিয়া বোধ হইত যে, যেন পথে একটি ছাতাই যাইতেছে। ঈশ্বরচন্দ্রের মস্তকটি আবার তাঁহার ক্ষুদ্র শরীরের অনুপাতে বৃহৎ ছিল। এই জন্য বিদ্যালয়ের বালকেরা ঈশ্বরচন্দ্রকে "যশুরে কৈ" বলিয়া তামাসা করিত, কখন কখন আবার উল্টাইয়া বলিত, "কশুরে জৈ"। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র বড় রাগিয়া যাইতেন। তিনি রাগিলে আর কথা বলিতে পারিতেন না, কারণ তিনি বাল্যকালে তোৎলা ছিলেন।

কলেজে প্রবেশের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিদিন যাহা পড়িতেন, গৃহে আসিয়া পিতার নিকট পুনরায় তাহা আবৃত্তি করিতে হইত। একটি কথা এদিক ওদিক হইলে আর রক্ষা থাকিত না। ভ্রমবশতঃ একটি কথা বলিতে বিস্মৃত হইলে ঠাকুরদাস অমনি ধরিতেন। পিতা এইরূপ ভাবে পুত্রের পাঠ লইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে বয়সের অপেক্ষা অনেক বেশী পরিশ্রম করিতে হইত। সে পরিশ্রমের ত্রুটি হইলে পিতার নিকট অত্যধিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত। সমস্তদিনের পরিশ্রমে কাতর হইয়া কখন কখন তিনি পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। পিতা রাত্রে কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতেন যে, প্রদীপ জ্বলিতেছে আর ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার আর রক্ষা থাকিত না। কোনও কোনও দিন এতই প্রহার করিতেন যে, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিত। ঈশ্বরচন্দ্র এইরূপ প্রহারের ভয়ে নিদ্রার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য অনেক সময়ে চক্ষে প্রদীপের তৈল দিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেন। এই উপায়ে রাত্রি জাগরণ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পড়াশুনা করিতেন, ইহার উপর ঠাকুরদাস শেষ রাত্রে বালকের ঘুম ভাঙ্গাইয়া বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ও উদ্ভট কবিতা মুখে মুখে শিখাইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র তিন বৎসর কাল ব্যাকরণের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। দুইবৎসর পরীক্ষায় উত্তম ফললাভ করিয়াছিলেন। একবার উৎকৃষ্ট পরীক্ষা দিয়াও আশানুরূপ পুরস্কার না পাইয়া

একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন। বিদ্যালয়ের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। জেদের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দেশে গিয়া সার্ব্বভৌমের টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করা স্থির করেন। অবশেষে অবশ্য আত্মীয় স্বজনগণের অনুরোধে তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। সেইবারের পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, সেইবার একজন সাহেব পরীক্ষক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ত্বরিত উচ্চারণে অক্ষমতা নিবন্ধন ধীরে ধীরে পরীক্ষা দান এবং কথাসকল পরস্পর হইতে পৃথক ভাবে বিলম্বে উচ্চারিত হওয়ায় পরীক্ষক সাহেবের নিকট একটা বিশেষ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। এই জন্য ঈশ্বরচন্দ্র সেবারে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই।

পঠদ্দশায় ঈশ্বরচন্দ্রকে ভীষণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, কখন অন্ন জুটিত, কখন জুটিত না; যখন জুটিত, তখনও সকল সময়ে পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেন না। যখন পেট ভরিয়া অন্ন জুটিত, তখন আবার ব্যঞ্জনের অভাবে কেবল নুনভাতে দিনপাত করিতেন; যখন তরকারী ও মৎস্য পাইতেন, তখন মৎস্যের ঝোল রাঁধিয়া একবেলা ভাত আর সেই ব্যঞ্জনের ঝোল খাইয়া, বৈকাল বেলার জন্য তরকারী ও মৎস্য রাখিয়া দিতেন, বৈকালে সেই ব্যঞ্জনের তরকারী দ্বারা অন্ন উদরস্থ করিয়া মাছগুলি পরের দিনের জন্য রাখিয়া দিতেন। পরদিন সেই মাছের অম্বল রাঁধিয়া তাহার দ্বারাই সেদিনকার আহার সমাধা করিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভবিষ্যৎকালে দয়ার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া সংসারে বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই অসাধ্য সাধনের প্রথম অঙ্কুর বিদ্যালয়ে বাল্যসহচরদিগের পরিচর্য্যার মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। পিতা দরিদ্র, নিজে সর্ব্বদা উদরপূর্ণ আহার পাইতেন না, অথচ বিদ্যালয়ে যে বৃত্তি পাইতেন, সময়ে সময়ে তাহারও কিছু কিছু অন্য সহাধ্যায়ীদিগের সাহায্যার্থে ব্যয় করিতেন। কাহারও পীড়া হইয়াছে শুনিবামাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। নিজে বাড়ীর চরকা-কাটা সূতায় প্রস্তুত মোটা চটের মত কাপড় পরিয়া নিজের অর্থে অন্য দরিদ্র বালক-দের জন্য অপেক্ষাকৃত ভদ্রতর পরিধেয় ক্রয় করিয়া দিতেন। এইরূপে তিনি বাল্যকালেই নিজের দুরবস্থা বিস্মৃত হইয়া অন্যের সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন ব্যাকরণ শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, সে সময়ে তাঁহার বয়স একাদশ বৎসর মাত্র। সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবেশ কালে তাঁহার উপনয়ন সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হয়। ঈশ্বরচন্দ্র যখন সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন তখন সেই শ্রেণীর শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় বালকের বয়সের অল্পতাহেতু তাঁহাকে লইতে আপত্তি করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ভয়ানক অভিমানী ছিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র তিনি বলিলেন, "সাহিত্য বিষয়েই আমাকে পরীক্ষা করিয়া লইলে ভাল হয়, নতুবা আমাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।" তখন তর্কালঙ্কার মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে ভট্টিকাব্যের কয়েকটি কঠিন কবিতার অর্থ

করিতে বলিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র অনায়াসে সেই কবিতাগুলির সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন। তখন আর তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্য শ্রেণীতে লইতে আপত্তি রহিল না।

সাহিত্য শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম বৎসর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। সাহিত্যের শেষ পরীক্ষায়ও তিনি সকল সহাধ্যায়ীকে পশ্চাতে ফেলিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই তাঁহার এই পরীক্ষার ফল দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় রন্ধন কার্য্য করিতে হইত। বাসায় দাস দাসী ছিল না, প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময় বাজার হইতে মাছ ও তরকারি কিনিয়া লইয়া তিনি বাসায় ফিরিতেন। বাসায় আসিয়া নিজেই মসলা বাটিতেন, তরকারি ও মাছ নিজেই কুটিতেন। চারি পাঁচ জনের আহারের আয়োজন করিয়া তাহাদিগকে আহার করাইয়া ও নিজে আহার করিয়া, সে সকল ভোজনপাত্র নিজেই পরিষ্কার ও ধৌত করিতেন, আহারের স্থান পরিষ্কার করিতেন, তাহার পর কলেজে যাইতেন। এইরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর দিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া উত্তর-কালে নির্ভয়ে ও শান্তচিত্তে সকল বিপদের ভার বহন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর তখন ক্ষীরপাই গ্রাম নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্যের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা দীনময়ী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথমে বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পিতা মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন, কেবল এই কারণে তিনি বিবাহে সম্মতি দান করেন।

চার

সাহিত্য শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। এই শ্রেণীতেও তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃ কনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু কাজের বেলায় প্রথম হইতেন। এই শ্রেণীতে একবৎসরের মধ্যে তিনি যাবতীয় পাঠ্য অলঙ্কার গ্রন্থ শেষ করিয়া বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন।

এই সময় পরীক্ষার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত, তাহার উপর আবার বাসার সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক কার্য্য করিতে হইত, তাই তিনি পরীক্ষার পর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই প্রতিমা পূজার তাদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু আস্থাবান্ হিন্দুগণ যেরূপ ভক্তি সহকারে দেবপূজা করিতেন, ঈশ্বরচন্দ্রও সেই প্রকার ভক্তির সহিত স্বীয় জনক জননীর পূজা করিতেন। তিনি বলিতেন, সংসারে মাতাপিতা জীবন্ত দেবতা। পিতৃ-মাতৃ-পূজা ত্যাগ করিয়া বা মাতাপিতার প্রতি—তাঁহাদের নানাপ্রকার দুঃখকষ্টের প্রতি উদাসীন হইয়া দেব-পূজায় ধর্ম্ম হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্র তাস, পাশা প্রভৃতি অলস ক্রীড়ার পক্ষ-পাতী ছিলেন না। বীরসিংহে যখনই তিনি যাইতেন, তখনই তিনি ছোট ছোট বালকদিগকে লইয়া কপাটি

খেলিতেন, সমবয়স্কদিগকে লইয়া লাঠি খেলিতেন ও কুস্তি করিতেন।

তৎকালে স্মৃতিশাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে জজপণ্ডিতের পদ পাওয়া যাইত। এই পরীক্ষা দিতে অন্ততঃ দুই তিন বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র ছয় মাস পরিশ্রম করিয়া এই পরীক্ষা দিলেন এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলেন; সপ্তদশ বর্ষীয় বালকের এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতায় সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিছুদিন পরেই ত্রিপুরার জজ পণ্ডিতের পদশূন্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ঐ পদের জন্য আবেদন করেন। ঐ পদের জন্য তাঁহার নিয়োগ-পত্র আসে। কিন্তু পিতার অসম্মতির জন্য তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

অন্যান্য পরীক্ষা শেষ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র উনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বেদান্ত শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। এই সময়ে স্মৃতি, ন্যায় ও বেদান্ত শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার সময় সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য রচনার নিয়ম ছিল। উভয় পরীক্ষা একদিনেই হইত। ঈশ্বরচন্দ্র এই পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একশত টাকা বৃত্তি লাভ করিলেন।

ইহার পর তিনি বেদান্তের পরীক্ষা দিয়া ন্যায় ও দর্শনের শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। এই শ্রেণীতে একবৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে একশত টাকা বৃত্তি পাইলেন। এবং সেবার কবিতা রচনায় তাঁহার পরীক্ষা দানও অপর সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট

বিবেচিত হওয়ায় তিনি আরও একশত টাকা বৃত্তি লাভ করিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত বিদ্যার সকল বিভাগেই সমান ভাবে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া অধ্যাপকমণ্ডলী বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি দান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।

পাঁচ

কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মার্শেল সাহেবের অধীনে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম চাকরি আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে মার্শেল সাহেব যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখনই তিনি ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের গুণের পরিচয় পাইয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য হওয়ায় মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খোঁজ করিলেন। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এই জন্য সংবাদ দেওয়া হইল। ঠাকুরদাস গৃহে গমন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয় মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন।

বিলাত হইতে আগত সিভিলিয়ানগণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দেশীয় ভাষাসকল শিক্ষা করিয়া পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে কার্য্যপ্রাপ্ত হইতেন। যাঁহারা দেশীয় ভাষার পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না, তাঁহাদিগকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত। তাই মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পরীক্ষার কড়াকড়িটা একটু কমাইতে অনুরোধ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "ওটি আমাকে দিয়ে হবে না। না হয় চাকরী ছাড়িয়া দিব, তথাপি অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারিব না।" মার্শেল সাহেব

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায়-নিষ্ঠা দর্শনে তাঁহার প্রতি আরও অধিকতর অনুরাগাকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

কর্ম্ম গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইংরেজী শিক্ষার সূচনা হইল। তিনি ইংরেজী ও হিন্দী উভয় ভাষা এক সঙ্গে শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরেজী ভাষার শিক্ষার জন্য তিনি মাসিক ১৫৲ এবং হিন্দী ভাষা শিক্ষার জন্য মাসিক ১০৲ বেতন দিয়া দুইজন গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি অতি অল্পকাল মধ্যেই ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে পিতাকে সেই কঠোর শ্রমকর চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরদাসের ইচ্ছা না থাকিলেও কেবল পুত্রের অনুরোধে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতাকে মাসে মাসে কুড়ি টাকা করিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। বাকী ত্রিশ টাকায় অতিকষ্টে কলিকাতার বাসায় নয়জন লোকের খরচ চালাইতে লাগিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা উপার্জ্জনাক্ষম হইয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যায়ক্রমে রন্ধনাদি কার্য্যে সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় বঙ্গদেশে একশত একটি বাংলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ঐ সমুদয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন ঐ

একশত একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের পরীক্ষা গ্রহণ ও নিযুক্ত করণের ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল।

পড়াইবার মত বাংলা পুস্তক সে সময়ে ছিল না। যাহা ছিল, দুই একখানি ব্যতীত প্রায় সমস্তই অপাঠ্য। হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাঙ্গালা পুস্তক রচনার চিন্তা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানস-রাজ্য অধিকার করে।

যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কার্য্য করিতেছিলেন, তখন তিনি বাড়ী হইতে মাতার একখানি পত্র পাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহোপলক্ষে জননী তাঁহাকে বাড়ী যাইতে লিখিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের নিকট ছুটি চাহিলেন। কিন্তু সে সময়ে এত বেশী কাজ যে, বিশৃঙ্খলাভয়ে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিদায় দিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং তাঁহার আর বাড়ী যাওয়া হইল না। অন্তর্দাহ ও উৎকণ্ঠায় তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তিনি অনিদ্রায় বহু কষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া শেষে প্রাতঃকালে মার্শেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমার মা আমাকে বাড়ী যাইতে বলিয়াছেন, আমাকে বাড়ী যাইতেই হইবে। যদি বিদায় না দেন, আমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম, মঞ্জুর করুন, আমি বাড়ী যাইব।" সাহেব মাতৃভক্তির এই স্বর্গীয় দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমাকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে না, আমি ছুটি দিতেছি, তুমি বাড়ী যাও।" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না,

তিনি বাড়ী ফিরিয়া আহারাদি করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সে সময়ে বর্ষাকাল। প্রবল বর্ষাগমে পথঘাট অত্যন্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। বহু কষ্টে এক পা এক পা করিয়া তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন, এইরূপ ক্লেশে কতদূর অগ্রসর হইয়া সেদিন ঈশ্বরচন্দ্রকে দামোদরের পূর্ব্ব-পারে রাত্রি যাপন করিতে হইল। পরের দিন তাঁহাকে বাড়ী যাইতেই হইবে। সেই দিনই বিবাহ। তিনি জানিতেন, তিনি বাড়ী না গেলে জননীর আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই ভাবনার তাড়নায় তিনি ত্বরিত গমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভীষণ কলেবর দামোদর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দামোদরে তখন বর্ষার জল নামিয়াছে। প্রবল কলরবে দামোদর ভীষণ তরঙ্গ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে করিতে তীর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। পারের নৌকা পরপারে চলিয়া গিয়াছে, নৌকার জন্য অপেক্ষা করিতে গেলে সেদিন আর বাড়ী যাওয়া হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া সেই দামোদর-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। যাহারা পারে যাইবে বলিয়া বসিয়াছিল, তাহারা অনেকেই নিষেধ করিল, কেহ কেহ বাধাও দিল। কিন্তু মাতৃআজ্ঞা পালনে বদ্ধপরিকর ঈশ্বরচন্দ্র কোনও বাধাই মানিলেন না। সাঁতার কাটিয়া অবলীলাক্রমে তিনি যাইয়া পরপারে উঠিলেন। অপরাহ্ণে দারকেশ্বর নদও পূর্ব্ববৎ পার হইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথে মাঠের মধ্যে সন্ধ্যা হইল। সেখানে আবার দস্যুভয়। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার

ইষ্টদেবতা মাতৃপদ স্মরণ করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রায় প্রহরার্দ্ধ রাত্রি অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর গৃহে পৌঁছিলেন। সেই সিক্ত বস্ত্রে ও ক্লান্ত শরীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া, "মা, মা আমি আসিয়াছি" বলিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন। বর ও বরযাত্রীরা তখন চলিয়া গিয়াছে, জননী একটি ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে মর্ম্মাহত হইয়া রোদন করিতেছিলেন। পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া জননী অশ্রু মোচন করিতে করিতে দ্বার খুলিয়া পুত্রের নিকট আসিলেন। বিদ্যাসাগর জননীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তাহার পর দুইজনে আহার করিতে বসিলেন। জননীর প্রতি এমন অকৃত্রিম ভক্তি আর কোথায়ও দেখা যায় না।

ছয়

রবার্ট কস্ট নামে একজন সিভিলিয়ান ছাত্র এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়িতেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন। কস্ট সাহেব একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি আমার নামে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া দিলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণকালের জন্য সাহেবকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তখনই একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া দিলেন। কস্ট সাহেব ইহাতে যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দুইশত টাকা পুরস্কার প্রদান করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে সেই টাকা না লইয়া, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র রচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাহাকে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া কস্ট সাহেবকে ঐ টাকা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের নিকট জমা রাখিতে বলিলেন। তদনুসারে চারি বৎসর কাল সংস্কৃত রচনার পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র পঞ্চাশ টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছে : যেখানে যে কোনও প্রকার সদুপায়ে অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ উপস্থিত হউক না কেন, এবং অর্থের পরিমাণ যতই হউক না কেন, তাহাতে দরিদ্র বিদ্যাসাগরের মন টলিত না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাতেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি দেশ ভ্রমণ, সন্তোষ, ক্রোধ, মেঘ প্রভৃতি নানা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পৌরাণিক নামানুসারে, শাল্মলী দ্বীপ,

কুশ দ্বীপ, শাক দ্বীপ প্রভৃতি এবং পাশ্চাত্য মতে আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আফ্রিকা ও এশিয়া দেশ সম্বন্ধে ৪০৮টি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।

রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুর পর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে উক্ত পদে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন।

সেকালে অধ্যাপক মহাশয়গণের অনেকে চেয়ারে বসিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন, আর তাঁহাদের বালক শিষ্যগণ তালবৃন্তের পাখা দ্বারা ব্যজন করিয়া তাঁহাদের সুষুপ্তি-জনিত তৃপ্তি বৃদ্ধি করিত। পণ্ডিত মহাশয়েরা নিদ্রা-সুখ সম্ভোগান্তে অপরাহ্ণে ছাত্রগণকে পড়াইতেন। পূর্ব্বে সময়ের একটা বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল না। শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে কে কখন আসিত, কে কখন যাইত, তাহার কোনওরূপ ব্যবস্থা ছিল না। যখন যাঁহার ইচ্ছা হইত তিনি তখন আসিতেন, যখন যাঁহার যাইবার ইচ্ছা হইত, তিনি তখন চলিয়া যাইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে অধ্যাপক মহাশয়দিগের নিদ্রা নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রগণের যাওয়া-আসার সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে কোনও বালক ইচ্ছা করিবামাত্র, যে কোনও সময়ে, কলেজের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় কাষ্ঠখোদিত পাস্ লইয়া বাহিরে যাইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহকারী সম্পাদক রূপে প্রবিষ্ট

হইবার সঙ্গে সঙ্গে তথাকার অনিয়মানুবর্ত্তিতার স্থানে বিধি-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা দেখা গিয়াছিল। তিনি দিন দিন নূতন নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন দ্বারা সংস্কৃত কলেজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা-সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার চিন্তাশীলতা ও প্রতিভার পরিচয় দিতেছে।

এই সময়ে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে হিন্দূ কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সাহেব বোধহয়, বাঙ্গালীর প্রতি তত অনুকূল ভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া অর্দ্ধশায়িতা-বস্থায় চেয়ারে বসিয়া সমাগত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিনা অভ্যর্থনায় দাঁড় করাইয়া রাখেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ-ভাবে অপমানিত হইয়াও স্বকার্য্য সাধন করিয়া নীরবে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তিনি কার সাহেবের এই অভদ্র ব্যবহার এবং অসম্মান প্রদর্শনের কথা সহজে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই অধ্যক্ষ কার সাহেবকে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কার্য্যো-পলক্ষে যাইতে হইল। তখন বিদ্যাসাগর মহাশর সাহেবের পূর্ব্ব অভদ্রোচিত ব্যবহারের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার সুযোগ পাইলেন। কার সাহেব সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সুবঙ্কিম চট্টরাজ পরিশোভিত চরণযুগল টেবিলের উপর তুলিয়া দিয়া, সাহেবের ন্যায় চেয়ারে হেলান দিয়া অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সাহেবকে

গৃহমধ্যে আসিতে বলিলেন। সেখানে আর দ্বিতীয় বসিবার আসন ছিল না। সাহেব গৃহে প্রবেশ করিয়া তদবস্থাপন্ন বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া অপমানিত মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বহু কষ্টে আপনার কার্য্য শেষ করিয়া সত্বর সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই অশিষ্ট ব্যবহারে বিষয় কর্ত্তৃপক্ষ ময়েট সাহেবের গোচর করিলেন।

ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৈফিয়ৎ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন তাহা অতীব আমোদজনক। তিনি কৈফিয়তে বলিয়াছিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম, আমরা অসভ্য, সুসভ্য ইংরেজীমতে লোকের অভ্যর্থনা করিতে হইলে বুঝি ঐরূপই করিতে হয়। আমি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের নিকট ঐরূপ শিষ্টাচার শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি এবং অবসর পাইয়া সাহেবের প্রতিও সেইরূপ ভাবে সম্মান দেখাইতে কৃপণতা করি নাই। ইহা যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, তবে এইরূপ ব্যবহারের শিক্ষাদাতা কার সাহেবই সেজন্য দায়ী। এই ঘটনায় আমার বিন্দুমাত্র দোষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।" শিক্ষা-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মসম্মানবোধ ও তেজস্বিতা সন্দর্শনে আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই গোলযোগ মিটাইবার জন্য কার সাহেবকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে কার সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপোষে গোলযোগ মিটাইয়া লন। এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই জয়ী হইলেন।

সাত

সংস্কৃত কলেজের কার্যপ্রণালী লইয়া সম্পাদক বাবু রসময় দত্তের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ মতান্তর ঘটিয়াছিল। স্বকীয় ব্যবস্থার ব্যতিক্রম দেখিয়া স্বাধীনচেতা ও পুরুষপ্রকৃতি-সম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। সম্পাদক রসময় বাবু ও শিক্ষা-সমিতির অধ্যক্ষ ময়েট সাহেব এত অনুরোধ করিলেন, এত বুঝাইলেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র অচল অটল রহিলেন। বন্ধুবান্ধবেরা কহিলেন, "চাকরি ছাড়িয়া দিলে খাবে কি?" নির্ভীক বীরপুরুষ তীব্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "কেন, আলু-পটল বেচিয়া, মুদির দোকান করিব, তবুও যে পদে সম্মান নাই, সে পদ গ্রহণ করিতে চাহি না।" লোকের অধীন হইয়া চলা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। কাহারও তাঁবেদারি করা, কাহারও মুখাপেক্ষা করা, কাহারও কৃপাদৃষ্টি লাভাকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করা, তাঁহার অভ্যাস ছিল না। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক দিনের জন্যও তিনি চিন্তিত বা বিষণ্ণ হন নাই। বাসায় সে সকল অনাথ ছাত্র আহার করিত, তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিয়া দেন নাই।

কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত কোথায়ও কোন কাজকর্ম্ম করেন নাই। অবশেষে মার্শেল সাহেবের নিরতিশয় অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড্ রাইটারের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি বেশীদিন এই কার্য্য

করেন নাই। সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে কর্তৃপক্ষের একান্ত অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্তপদ গ্রহণ করেন। ইহা ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কর্ম্মে নিয়োগের পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বাবু রসময় দত্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত পদ লাভ করেন। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতন হয় মাসিক ১৫০৲ টাকা।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা-নীতির একটি বিশেষ পরিবর্ত্তনে হস্তক্ষেপ করেন। সংস্কৃত কলেজের সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের সন্তানেরা তথায় শিক্ষালাভ করিত, বৈদ্যেরা ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পাইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত অপর সমগ্র সংস্কৃত শিক্ষা ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতিকেই দেওয়া হইবে। কলিকাতা ও অন্য নানা স্থানের অধ্যাপকমণ্ডলী এই প্রস্তাবে ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা করিয়া দেবভাষা সংস্কৃতের চর্চ্চায় সকলকে অধিকার দিতে অসম্মত হইলেন এবং প্রাণপণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধপক্ষ প্রবল করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গেল। তদবধি সংস্কৃত কলেজে অপর জাতি সকলের প্রবেশ লাভ ও শিক্ষা প্রাপ্তির দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণের বেতন লাগিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় নূতন প্রবেশার্থিগণের পক্ষে বেতনের ব্যবস্থা করিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রস্তাব মত নূতন

প্রবেশার্থীর বেতন ধার্য্য হয়। অসমর্থ ছাত্রগণের সুবিধার জন্য নিয়ম করা হইয়াছিল যে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দরিদ্র বালক বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে পড়িতে পারিবে। অদ্যাপি সেই নিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দেবভাষা সংস্কৃতের প্রবেশদ্বার ব্যাকরণ রূপ সুদৃঢ় লৌহময় কবাট দ্বারা সুরক্ষিত। কি উপায় অবলম্বন করিলে এই লৌহ-কবাট সহজে মুক্ত করিতে পারা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বহু চিন্তা করিয়া তিনি সহজে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য "উপক্রমণিকা" রচনা করিলেন। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার যে প্রবল স্রোত এ দেশে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার মূলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ও পরবর্ত্তী ব্যাকরণগুলি বহুল পরিমাণে কার্য্য করিয়াছে। এক্ষণে কি পল্লী, কি নগর, সর্ব্বত্রই বিদ্যানুশীলনরত কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ সকলেই যে কিছু না কিছু সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতেছেন, উপক্রমণিকা দ্বারা ব্যাকরণের দুর্গম পথ পরিষ্কৃত হওয়াই তাহার মূল কারণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যদি আর কোনও কার্য্য না থাকিত, তথাপি উপক্রমণিকাদি রচনা দ্বারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া, এই একমাত্র কার্য্যের জন্যও দেশীয় লোকদিগের নিকটে তিনি চিরকাল কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন যে, ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া অল্পবয়স্ক ছাত্রগণকে রঘুবংশ প্রভৃতি সুকঠিন গ্রন্থ পাঠ করান বৃথা সময় নষ্ট করা মাত্র। কোমলমতি বালকগণ সহজে তাহার

প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না। বিদ্যালয়ের এই গুরুতর অভাব মোচন করিবার জন্য তিনি সহজবোধ্য সংস্কৃত গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ ও মহাভারত প্রভৃতি হইতে সঙ্কলন করিয়া "ঋজুপাঠ" নাম দিয়া তিনখানি পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে সংস্কৃত-শিক্ষার্থী বালকগণের শিক্ষালাভের পথ সুগম হইয়াছিল।

বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র বিদ্যালয়ে যে গ্রীষ্মাবকাশ হইয়া থাকে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে তাহার প্রথম প্রবর্ত্তক অনেকেই তাহা অবগত নহে। কলিকাতায় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে দারুণ গ্রীষ্মের অসহনীয় উত্তাপে লোকে ছট্‌ফট্‌ করে। এইরূপ প্রখর তাপদগ্ধ মধ্যাহ্ন সময়ে অত্যধিক পরিশ্রমে বালকগণের শরীর ও মন নিস্তেজ এবং অসুস্থ হইয়া পড়ে, এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষা-বিভাগকে অনুরোধ করিয়া দুইমাস গ্রীষ্মাবকাশ মঞ্জুর করাইয়া লন। এই হইতে সমগ্র বাংলা দেশে ক্রমে ক্রমে গ্রীষ্মের ছুটি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যখন এই সকল নূতন পরিবর্ত্তন দ্বারা কলেজের ও সমগ্র শিক্ষা-বিভাগের বিবিধ উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার কার্য্য-কলাপের যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইয়া গেল।

আট

নিরন্ন দরিদ্র নরনারীগণের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃঢ়তর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়লাট ও ছোটলাট-ভবনে বহু সমাদরে উপবিষ্ট, যে বিদ্যাসাগর মহাশয় মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহনের পাথুরিয়াঘাটা প্রাসাদে বহু সম্মানে গৃহীত ও সমাদৃত, যিনি পাইকপাড়া রাজ-ভবনে পূজিত, সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ই দরিদ্রের পর্ণকুটীরে মুমূর্ষু রোগীর শয্যাপার্শ্বে প্রাতঃসন্ধ্যা সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত।

এইস্থলে একটি ঘটনার কথা বলিব। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই বিশ্রামের জন্য কারমাটারে যাইতেন। একদিন প্রাতঃকালে এক মেথর কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানাইল, "আমার ঘরে মেথরাণীর কলেরা হইয়াছে, বাবা, তুমি কিছু না করিলেত আর উপায় নাই।" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় এক ভৃত্যের দ্বারা কলেরার ঔষধের বাক্স আর একটা বসিবার মোড়া লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই অস্পৃশ্য ব্যক্তির অপরিচ্ছন্ন ভগ্ন কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সমস্ত দিন সেই মলরাশির মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়া রোগিণীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। প্রায় সন্ধ্যার সময় সেই রোগীকে এক প্রকার নিরাপদ করিয়া গৃহে আসিয়া স্নানাহার করিলেন। বিদ্যাসাগর-চরিতের মহত্ত্ব ও মাধুর্য্য এই দারিদ্র্য-নিপীড়িত নরনারীগণের সহিত আত্মীয়তা সংস্থাপনের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। এই গুণেই তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ, তাঁহার এতাদৃশ

লোকবিরল ও দেবপ্রকৃতিসুলভ উদার আচরণেই তিনি বঙ্গের চিরপ্রিয় হইয়া থাকিবেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পর কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনোপযোগী এক রিপোর্ট প্রদান করেন। তাহা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ময়েট্ সাহেব গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতন ১৫০৲ টাকার স্থলে ৩০০৲ টাকা করিয়া দেন এবং তাঁহার পরামর্শমত কলেজের বহুবিধ আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের উন্নতি সাধনের জন্য যেমন চিন্তা করিতেন, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলা দেশে শিক্ষা বিস্তারের সদুপায় সকলও চিন্তা করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টে বাংলা দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন এবং সেই সকল বিদ্যালয়ের উপযোগী শিক্ষক প্রস্তুত করণের জন্য নর্ম্যাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাবও উল্লিখিত হইয়াছিল। তদনুসারে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০০৲ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অতিরিক্ত ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর নদীয়া, হুগলী, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর এই চারি জেলার নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার পরিদর্শন ভার অর্পণ করেন। এই উভয় পদের মোট বেতন হইল ৫০০৲ টাকা। তাঁহারই অনুরোধ মত কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম নর্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হইল এবং তাহার তত্ত্বাবধানের ভার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হইল।

ইতঃপূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী পড়ার নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু কোনও প্রকার বাঁধাবাঁধি ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিয়ম করিলেন যে, প্রত্যেক বালককেই অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া যেরূপ নম্বর রাখিতে হয়, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে ইংরেজীতে পরীক্ষা দান এবং সেই পরীক্ষার নম্বরও বিশেষরূপে বিবেচিত হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় বিদ্যালয়ের সকল বালকই আগ্রহ সহকারে ইংরেজী শিখিতে লাগিল। এইরূপ নিয়ম হইবার কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গ অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলীর সহিত সমকক্ষতায় কৃতকার্য্য হইয়াছিল। এই সুফল দর্শনে বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর নানা বিষয় লইয়া ডাইরেক্টার ইয়ং সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনোমালিন্য ঘটিতে আরম্ভ করে। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব অনেক মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া প্রায় একবৎসর কাল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শান্তভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল তাঁহারই আত্মীয়তার অনুরোধে বাধ্য হইয়া সেবার যে সঙ্কল্প হইতে বিরত হন। কিন্তু যখনই ইয়ং সাহেবের আত্মীয়তার অভাব প্রকাশ পাইত তখনই কর্ম্ম ত্যাগের সঙ্কল্প নূতন করিয়া তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিত।

অবশেষে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়

সেই যে কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন, আর বহু চেষ্টাতেও সেই কার্য্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ছোটলাট সেই সময় একবার বুঝাইবার জন্য বলিয়াছিলেন,—আপনি এত বড় সমাজসংস্কার-কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে অর্থাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, মহাশয়, যদি বা আপনার অনুরোধে একটা চিন্তা করিতাম, যখন বিপদের ভয় দেখাইতেছেন, তখন আর ও "ছাই ভস্ম" গ্রহণ করিব না। এই যে ছাড়িয়া দিয়াছি, উহাই আমার শেষ কার্য্য।

নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক ও উপরোধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবনের পথে চলিবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। এই প্রভূত আয়ের ও বহু সম্মানের কর্ম্ম পরিত্যাগ করা উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক বন্ধু স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বিদ্যাসাগর, তুমি কাজটা ভাল করিলে না।" বিদ্যাসাগর এই কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমি টাকা অপেক্ষা,—পদমর্য্যাদা অপেক্ষা, সম্ভ্রমই বহু মূল্যবান্ মনে করি। যে কাজে সম্ভ্রমের অপচয় হয়, আমি সে কাজ করিতে চাই না।"

যদিও এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে তাঁহার মত ব্যয়শীল ও মর্য্যাদাশালী লোকের পক্ষে দিন চলা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তিনি সহসা কিছু করিলেন না। তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার জেম্‌স্ কলভিন

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আইনের পরীক্ষা দিতে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আইনের পরীক্ষা দিয়া সুপ্রিম কোর্টে ওকালতি করিতে পরামর্শ দেওয়াতে প্রথমতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় অসম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এখন আবার নূতন করিয়া পরীক্ষা দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, বিশেষতঃ ওকালতি কার্য্যে আমার বিশেষ অনুরাগ নাই।" সাহেব তথাপি অনেক অনুরোধ করায় তিনি সম্মত হইলেন, এবং সেই কার্য্যের ফলাফল দর্শন করিবার জন্য কয়েক দিন তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সেখানে মোকদ্দমা ব্যবসায়ী লোকদের আচার-ব্যবহার যাহা কিছু দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ মন্দীভূত হইয়া গেল। তিনি কলভিন সাহেবের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহার অনিচ্ছার কথা জ্ঞাপন করিলেন।

নয়

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ "বাসুদেব চরিত"। তৎপরে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন, ইহাই তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক সকলের আদি গ্রন্থ। এই পুস্তকখানি রচিত হইবার পর উহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে প্রথম মন্তব্য প্রকাশের ভার ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হয়। কিন্তু তিনি ঐ গ্রন্থ উৎকৃষ্ট মনে না করিয়া উহা পাঠ্য হইতে আপত্তি করেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিতান্ত নিরুপায় বোধ করিয়া শ্রীরামপুরের পাদরী সাহেবদিগের শরণাপন্ন হন। পাদরী মার্স ম্যান সাহেব সে সময় প্রচলিত সমুদয় গদ্য পুস্তকের মধ্যে উক্ত নব প্রকাশিত বেতাল পঞ্চবিংশতিকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়া এক প্রশংসা পত্র প্রদান করেন। ইহাতে উক্ত পুস্তক পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়।

একশত খণ্ড বেতাল পঞ্চবিংশতি তিন শত টাকায় মার্শেল সাহেব ক্রয় করেন। অবশিষ্ট পুস্তকগুলি বন্ধুবান্ধবদিগকে উপহার দিতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। মার্শেল সাহেব যে তিন শত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই পুস্তক মুদ্রণের ব্যয় কুলাইয়া যায়। ভাষা বিষয়ে বেতাল পঞ্চবিংশতিই বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম পুস্তক।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্স ম্যান সাহেব কৃত ইতিহাস অবলম্বনে বাংলার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়া

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া তৎকালীন শেষ গভর্ণর জেনারেলের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত করিয়া একখানি ইতিহাস রচনা করেন।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে চেম্বার্স বায়গ্রাফি নামক পুস্তক হইতে অনুবাদ করিয়া "জীবন চরিত" প্রণয়ন করেন। এই জীবন চরিতে বিদেশীর বীরত্ব কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পদমাধুর্য্য বিষয়ে বেতাল পঞ্চবিংশতি যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ভাষার ওজস্বিতা বিষয়ে জীবন চরিত সেইরূপ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় চেম্বার্স রুডিমেণ্টস্ অব নলেজ নামক পুস্তকের ছায়া অবলম্বনে বালকদিগের পাঠোপযোগী করিয়া শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ বা 'বোধোদয়' রচনা করেন। এই পুস্তকে সহজ ও সরল ভাষায় পদার্থ বিভাগ, বস্তু বিচার, কাল বিভাগ ও সংখ্যাদি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সরলভাবে বালক বালিকা-দিগকে বুঝাইবার উপযোগী এই প্রকার বাংলা গ্রন্থ অতি বিরল।

ইহার পর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাকবি কালিদাস প্রণীত "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নামক নাটকের উপন্যাস ভাগ অবলম্বনে এক অতি উপাদেয় সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন, ইহার নাম "শকুন্তলা"। শকুন্তলার সমাগমে বাংলা সাহিত্য এক অপূর্ব্ব নূতন শ্রী ধারণ করিল। শকুন্তলায় তাঁহার লিপি-চাতুর্য্য, রচনা মাধুর্য্য ও পদলালিত্য দর্শনে পাঠক মাত্রেই

মোহিত হইয়া গেল এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার প্রশংসা বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বৎসরেই তাঁহারসুপ্রসিদ্ধ "বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক" রচনা ও প্রচার করেন। বিধবা বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনে ব্যাপৃত থাকিয়া এবং কলেজের কাজকর্ম্ম যথারীতি সম্পন্ন করিয়াও তিনি বহু গ্রন্থ রচনায় নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দুই ভাগ বর্ণপরিচয়, কথামালা ও চরিতাবলী এই বৎসরেই রচনা করিয়াছিলেন।

ইহার পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণের পরিচয় হয়। এই সময়ে প্রচারিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্য্যের সহায়তায় তিনি ব্রতী ছিলেন। নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা দ্বারা তত্ত্ববোধিনীর শোভা ও গৌরব বৃদ্ধির পক্ষে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে উক্ত সংবাদপত্রের উৎপত্তি, তিনি সে সভায় সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তাঁহার বাংলা গদ্য মহাভারত রচনার সূচনা হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহাভারত রচনার সূচনা হয়। পরে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

এইরূপে পুস্তকাদি রচনার দ্বারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিছু কিছু আয় হইলেও তিনি যে সমুদয় বৃহৎ ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ সামান্য আয়ে তাঁহার অর্থাভাবের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই। কিন্তু তথাপি তাঁহার সৎসাহসের

অভাব ছিল না। তিনি মনের বল একটুও হারান নাই। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব যখন বলিয়াছিলেন, বিধবা বিবাহরূপ সুবৃহৎ ব্যাপারে প্রস্তুত হইয়া এবং বিধবা বিবাহের কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া এরূপ বহুবেতনের কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কি সুবিবেচনার কার্য্য হইতেছে? তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সগর্ব্বে উত্তর দিয়াছিলেন, "যখন বুঝিয়াছি, এক পোয়া চাউল হইলে দরিদ্র ব্রাহ্মণের দিনপাত হইবে, তখন আর অর্থের লালসায় পরিচালিত হইয়া আত্মসম্মান বিনাশ করিব কেন?"

ইহার পর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় "সীতার বনবাস" রচনা করেন। সীতার বনবাসে তাঁহার বাংলা রচনার শোভা ও সৌন্দর্য্য পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সীতার বনবাস বহুকাল ধরিয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইহার পর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আখ্যানমঞ্জরী, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণ কৌমুদীর অপরাংশ, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সটীক মেঘদূত এবং পীড়িতাবস্থায় বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে সেক্সপিয়র রচিত কমেডি অফ্ এররস্ (Comedy of Errors) নামক গ্রন্থাবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনা করেন। এই পুস্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার লিপি চাতুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষার্থী বালকগণের শিক্ষালাভের সুবিধার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুসংখ্যক সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বসমেত ৫২ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৩০ খানা বাংলা গ্রন্থ, তন্মধ্যে ১৪ খানা বিদ্যালয়ের পাঠ্য।

দশ

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহায়তায় ও ভারতবন্ধু প্রাতঃস্মরণীয় বেথুন মহোদয়ের উদ্যোগে কলিকাতা নগরীতে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হইলেও, ইহার অনেক পূর্ব্বে কলিকাতার নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত ও বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে এই শুভানুষ্ঠানের প্রথম অঙ্কুর অর্থাভাবের উত্তপ্ত ক্ষেত্রে পড়িয়া শুষ্ক হইয়া যায়। সকলের সমান আগ্রহ না থাকায় এবং যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে না পারায় ইহা সূচনাতেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইহা শ্মশানভস্মরূপে পরিণত হয়। প্রায় ২৫ বৎসর কাল ইহা শ্মশানভস্ম রূপেই থাকিয়া যায়। শাপগ্রস্তা অহল্যাদেবী যেমন যুগ যুগান্তর ধরিয়া পাষাণ কলেবরে কালাতিপাত করিতে করিতে সহসা শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র চরণস্পর্শে মুক্তিলাভ করেন, তেমনি দেবপ্রকৃতিসম্পন্ন বেথুন-সমাগমে শ্মশান-ভস্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল। নূতন উৎসাহে নূতন করিয়া স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা হইল। পরোপকারপরায়ণ বেথুন বঙ্গীয় নারী জাতির সুশিক্ষা সাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু আর একজন কৃষ্ণকায় মহাপুরুষ পশ্চাৎ হইতে বেথুন-হৃদয়কে বঙ্গীয় নারীগণের কল্যাণ সাধনে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, ইনিই অমরকীর্ত্তি সম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সদুপায় অবলম্বনের জন্য এবং বঙ্গদেশে নানা স্থানে ইংরেজী ও বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিদ্যাসাগর

মহাশয় সর্ব্বদাই বেথুন-ভবনে গমন করিতেন। এই যাতায়াতে পরস্পরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ক্ষুদ্রকায়া তটিনী যেমন পর্ব্বতগাত্র অতিক্রম করিয়া নিম্নভূমির দিকে অবতরণ করিতে করিতে বৃহদায়তন হইয়া প্রবল আবর্ত্তে সাগরাভিমুখে ধাবমান হয়, বেথুন-বিদ্যাসাগর সৌহার্দ্দ্যও সেইরূপ ত্বরিত-গতিসম্পন্ন স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবলতর ও গভীরতর আকার ধারণ করিল। সেকালে বেথুন ও বিদ্যাসাগরের সখ্যই বঙ্গীয় মহিলাগণের সৌভাগ্যাকাশে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। সেই বন্ধুতার ফলস্বরূপ স্ত্রীশিক্ষার সুপ্রচার সংসাধিত হইয়াছে।

গুণময় বিদ্যাসাগর বন্ধুমণ্ডলীর শত শত বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া বেথুন-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অগ্রসর হইলেন।

বেথুন সাহেব বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ও উন্নতি সাধনকল্পে আপনাকে নিযুক্ত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কেবল কলিকাতার বেথুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন কার্য্যে সহায়তা করিয়া নিশ্চন্ত ছিলেন, তাহা নহে। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের বাচনিক আদেশে মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী ও নদীয়া জেলার নানা স্থানে বহু-সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং এই

সকল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লইয়াই শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার ইয়ং সাহেবের সহিত স্থায়ী মনান্তরের সূচনা হইয়াছিল। এই চারি জেলার নানাস্থানে প্রায় পঞ্চাশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সমুদয় ব্যয়ভার বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বালিকারা বিনা বেতনে পড়িত। তাহাদের পাঠ্যপুস্তক, লিখিবার কাগজ, শ্লেট, পেন্সিল, সমস্তই দিতে হইত। এই বৃহৎ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।

এই সকল বালিকা বিদ্যালয়ের অনেকগুলি বহুকাল বর্ত্তমান থাকিয়া বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের প্রচুর সাহায্য করিয়াছিল। এই সমুদয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামেও একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতের বেতনও বালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তকাদিতে মাসে মাসে প্রায় ত্রিশ টাকা ব্যয় হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুকাল যাবৎ স্বয়ং এই ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

মিস্ কার্পেণ্টার এই সময়ে ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয় হইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মীয়তার সুত্রপাত হইল। আলাপ-পরিচয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। মিস্ কার্পেণ্টার যখন যেখানে যাইতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিতেন। উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় মিস্ কার্পেণ্টারের সঙ্গে গিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি বগি গাড়ীতে বালী ষ্টেশন হইতে উত্তরপাড়া যাইতেছিলেন, উত্তরপাড়ার অতি নিকটে যাইয়া পথে একস্থানে মোড় ফিরিবার সময় গাড়ীখানা উল্টাইয়া পড়ে, সেই পতনে বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ী হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হন। গুরুতর আঘাতে আহত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া রাজপথের অনতিদূরে তিনি একস্থানে পতিত হইলেন, ঘোড়াও গাড়ী সমেত অন্যত্র পতিত হইল। কার্পেণ্টারের গাড়ী নিকটে আসিলে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া সত্বর গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার নিকটে গেলেন এবং সেই পথের পার্শ্বে নিম্ন ভূমিতে বিদ্যাসাগরকে ক্রোড়ে তুলিয়া বসিয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন।

এই শকট হইতে পতনই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুস্থ শরীরে রোগ, সবল শরীরে দুর্ব্বলতা এবং চিত্তে অশান্তির সূত্রপাত করিল। সেই পতনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যকৃতে এরূপ গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল যে, ঐ স্থানের বেদনায় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল।

এগার

হিন্দু সমাজের বালবিধবাগণের অশান্তিময় দুঃখপূর্ণ জীবন দর্শনে একান্ত ব্যথিত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার একটা উপায় বিধান করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন। তিনি যদিও মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, ইহা একটি পুণ্যকর্ম্ম এবং বালবিধবাদিগের পুনরায় বিবাহ দিতে পারিলে সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে, তথাপি তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন শাস্ত্র প্রমাণাদিরদ্বারা বুছাইতেনা পারিলে সাধারণ লোক তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবে না। পূর্ব্বে যদিও আর্য্য সমাজে বালবিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু কালধর্ম্মে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহে শাস্ত্রের প্রমাণাদি সংগ্রহে যত্নশীল হইলেন, এই জন্য তাঁহার আহার-নিদ্রা ও বিশ্রাম চলিয়া গেল। তিনি দিবারাত্র হিন্দুশাস্ত্র মন্থনে নিজকে নিয়োজিত করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের কার্য্য শেষ করিয়া অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি সংস্কৃত কলেজের পুস্তকাগারে পুস্তক রাশির মধ্যে মগ্ন থাকিতেন এবং গ্রন্থ-কীটের ন্যায় পুঁথির পত্রে পত্রে বিচরণ করিতেন। সন্ধ্যার পর কলেজের নিকটস্থ তাঁহার বন্ধু শ্যাম বাবুর বাটী হইতে যৎকিঞ্চিৎ জলখাবার আসিত, কোনওদিন বা ক্ষণকালের জন্য নিজে গিয়া শ্যামবাবুর বাটীতে জলযোগ করিয়া আসিতেন। এইরূপে বহু দিন কাটিয়া গেল।

কিছুদিন পরে তাঁহার এই সাধনার ফল ফলিল। তিনি পরাশর সংহিতায় একটি শ্লোক পাইলেন,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

এই শ্লোক দেখার সঙ্গে—ইহার অর্থ সঙ্গতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে ও মনে এক বিচিত্র উল্লাস প্রকাশ পাইল। তিনি আনন্দে দিশাহারা হইলেন এবং গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "পাইয়াছি, পাইয়াছি" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ পরম কৌতূহল সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পাইয়াছ?" বিদ্যাসাগর মহাশয় অপূর্ব্ব প্রফুল্ল মুখে উত্তর করিলেন, "যাহার জন্য এত দিন এত ক্লেশ ভোগ করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি।"—এই বলিয়া শ্লোকটি তিনি তাহাদিগকে দেখাইলেন।

আজ আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে আনন্দের সীমা নাই। আজ তাঁহার সে বিশাল হৃদয়-বারিধি-বক্ষে যে আনন্দের তরঙ্গ উঠিয়াছে, সে লহরীলীলায় আজ তিনি মাতোয়ারা! তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বালবিধবার দুর্দ্দশা মোচনের উপায় করিবেন, আজ তাঁহার সেই লুক্কায়িত সঙ্কল্পের পূর্ব্বাকাশে প্রতিজ্ঞা পালনের আশা-সূর্য্যের প্রথম আভাস দেখা দিয়াছে। শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থনে যে সত্যরত্ন উদ্ধৃত হইল, অচিরকাল মধ্যে তাহার দিগন্তব্যাপী আলোকচ্ছটা দর্শনে লোক মুগ্ধ হইবে, ইহার প্রবল পরাক্রমে লোক নির্ব্বাক হইবে এবং শাস্ত্রাদেশে অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার হৃদয়ের গভীর তৃপ্তি বিধান করিবে।

যখন শাস্ত্র সংগ্রহ হইল, শাস্ত্রার্থ নির্ণয় হইল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই শাস্ত্রাদেশকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর সহজ জ্ঞান ও সুযুক্তি মার্গ অবলম্বনে এক গ্রন্থ রচনা করিলেন। অল্পের মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলি দিয়া বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা সপ্রমাণ করিলেন। পুস্তক রচনা করিলেন বটে, কিন্তু প্রথমেই তিনি তাহা প্রচার বা প্রকাশ করিলেন না। পুস্তক রচনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে তিনি পিতার নিকট গেলেন। পিতাকে গিয়া বলিলেন, "দেখুন, আমি শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থনের জন্য এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছি। আপনি শুনিয়া এবিষয়ে আপনার মত না দিলে, আমি ইহা প্রকাশ করিতে পারি না।"

ঠাকুরদাস পুত্রকে বলিলেন, "যদি আমি এই বিষয়ে মত না দেই, তবে তুমি কি করিবে ?"

বিদ্যাসাগর বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি বাঁচিয়া থাকিতে এই পুস্তক প্রচার করিব না।"

পিতা পুত্রকে বলিলেন, "আচ্ছা, কাল একবার নির্জ্জনে বসিয়া মনোযোগ সহকারে সমস্ত শুনিব, পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিব।"

পরদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতার নিকট বসিয়া পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পিতা সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর, যাহা লিখিয়াছ তাহা সমস্তই শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে ?" বিদ্যাসাগর অমনি বলিলেন, "হাঁ, তাহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"

উদারহৃদয় ঠাকুরদাস বলিলেন, "তবে তুমি এ বিষয়ে বিধিমত চেষ্টা করিতে পার। তাহাতে আমার আপত্তি নাই।"

পিতার আদেশ পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দপূর্ণ প্রাণে জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "মা, তুমি ত শাস্ত্র টাস্ত্র কিছু বুঝিবে না, আমি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে এই বইখানি লিখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত না পাইলে এই বই আমি ছাপাইতে পারি না। শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের বিধি আছে।"

ভগবতী দেবী অমনি বলিলেন, "কিছুমাত্র আপত্তি নাই, লোকের চক্ষুশূল, মঙ্গল কর্ম্মে অমঙ্গলের চিহ্ন, ঘরের বালাই হইয়া, সর্ব্বদা চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে যাহাদের দিন কাটিতেছে, তাহাদিগকে সংসারে সুখী করিবার উপায় করিবে, এতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।

এইরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয় জনক-জননীর সম্পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়া বীর বেশে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া প্রচার করিলেন। অমনি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তুমুলকাণ্ড উপস্থিত হইল। সর্ব্বত্র বিদ্যাসাগর ও বিধবা বিবাহের আলোচনা হইতে লাগিল। কতদিক্ হইতে প্রতিবাদ আসিতে লাগিল, কত লোক গ্রন্থ রচনা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগের ভ্রমপ্রমাদ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুসঙ্গত শাস্ত্র ব্যাখ্যার ক্ষুরধারে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের যুক্তিজাল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। ঐ সকল বিপক্ষ পক্ষের কূটতর্কের মীমাংসা

করিয়া ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি দ্বিতীয় বার বৃহদাকারে বিধবা-বিবাহ গ্রন্থ প্রচার করেন।

যখন বিধবা-বিবাহ সর্ব্বাংশে শাস্ত্রসিদ্ধ ও সদাচারসঙ্গত বলিয়া তিনি তাঁহার অনুরাগী বন্ধুমণ্ডলীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলেন, তখন কার সাধ্য, সে আগ্রহ এবং উৎসাহের স্রোত রোধ করে? বিধবা-বিবাহ দিবার জন্য চারিদিকে আয়োজনের সাড়া পড়িয়া গেল। এই সময়ে বিধবা-বিবাহ-পক্ষীয় লোকদের সমক্ষে আর এক গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইল। প্রশ্ন এই যে, বিধবার বিবাহান্তে তাহার গর্ভজাত সন্তানেরা পাছে বর্ত্তমান দায়ভাগ অনুসারে পৈতৃক সম্পত্তিতে স্বত্ববান না হয়, এই আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে গভর্ণমেণ্টের নিকট হিন্দু দায়ভাগের সঙ্গতি রক্ষার জন্য আবেদন করা হইল। প্রায় ২৫ হাজার লোক সমবেত হইয়া উক্ত আইন প্রণয়নের জন্য প্রার্থনা জানাইয়া আবেদন করায় সমগ্র বঙ্গদেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল।

বহু আন্দোলন এবং আলোচনার পর বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক আইন গভর্ণমেণ্ট দ্বারা বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। বিধবা বিবাহের পথে দায়ভাগ ঘটিত যে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মূলোচ্ছেদ হইল। এখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবার বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নানা স্থানে দুই একটি করিয়া বিধবা-বিবাহ হইতে লাগিল।

বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নানা প্রকারে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। যত প্রকার বিপদ

ঘটিয়াছিল তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিপদ এই যে, বিধবা-বিবাহের সূচনা হইতে কলিকাতার কেহ কেহ গোপনে তাঁহার প্রাণ সংহার করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সকলের চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়।

বিধবার বিবাহকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই কন্যাপক্ষ অবলম্বন করিয়া মহাসমারোহে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি নিজে একখানি থান ধুতি পরিয়া একখানি মোটা চাদর গায়ে দিয়া নিতান্ত দীন ব্যক্তির ন্যায় কালাতিপাত করিতেন। কিন্তু অপরের বেলায় ঠিক বিপরীত আচরণ করিতেন। বিধবা বিবাহে কন্যাকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া সম্প্রদানার্থে উপস্থিত করিতেন, এই ব্যাপারে তাঁহার বহু অর্থ ব্যয় হইত। বিধবা-বিবাহ বিষয়ে যাহারা সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই এক এক করিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল, কাজে কাজেই ক্রমে সমস্ত ব্যয়ভার বিদ্যাসাগরের উপর আসিয়া পড়িল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি শীঘ্র সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ক্রমে ঋণজালে জড়িত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্য হইতে পশ্চাৎপদ হইলেন না। তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি যে কিরূপ প্রবল ছিল, ন্যায়ানুষ্ঠানে তিনি কিরূপ নিষ্ঠার সহিত নিযুক্ত থাকিতেন, এবং সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও সেই অনুষ্ঠান সাধনে কিরূপ আগ্রহ সহকারে প্রাণমন সমর্পণ করিতেন, নানা প্রকার বাধা ও বিপদের মধ্যে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে লিপ্ত থাকাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

বিধবা বিবাহের আন্দোলন ও আইন পাশ লইয়া যে সময়ে

সমগ্র দেশবাসী বিব্রত, কেহ বা স্বপক্ষতা কেহ বা বিপক্ষতা করিতে বদ্ধপরিকর, ঠিক সেই সময়েই বঙ্গদেশীয় কুলীনগণের অনুষ্ঠিত বহুবিবাহ প্রথা রহিত করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু লোকের স্বাক্ষয়িত এক আবেদন-পত্র গভর্ণমেণ্টের নিকটে প্রেরণ করেন। বহুবিবাহ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে কতদূর স্থান পাইয়াছে এবং ইহার দ্বারা এদেশের কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার রচিত বহুবিবাহ-বিষয়ক বহু-বিস্তৃত গ্রন্থে তাহা অতি পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়াছেন।

বার

আজ যে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণেতর জাতি, হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজ-বিষয়ে আলোচনা করিয়া নিজ নিজ আত্মার কল্যাণ সাধন, মানসিক তৃপ্তিলাভ ও প্রভূত জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া চরিতার্থ হইতেছে, ইহার সূচনা ও শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের পরেই স্থানলাভ করিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু বিস্তৃতভাবে লোকশিক্ষার পথ সুপরিস্কৃত ও প্রশস্ত করিতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। লোকশিক্ষার জন্যই বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ক শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিরূপে চিরদিন বাংলা সাহিত্যের শোভা বর্দ্ধন করিবে।

তিনি বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া সস্কৃত কলেজে সাধারণ লোকের সংস্কৃত শিক্ষার দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত অন্য সমগ্র সংস্কৃত শিক্ষা ব্রাহ্মণেতর জাতির বালকগণ লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তাঁহার অবস্থার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জন্মস্থান বীরসিংহের সমগ্র অধিবাসিমণ্ডলীর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করেন। তিনি স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে যাইয়া বীরসিংহে উপস্থিত হন। গৃহে উপস্থিত হইয়া পিতৃদেব ও জননীর নিকট বীরসিংহ গ্রামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মাতাপিতা উভয়েই পুত্রের এই সাধু সঙ্কল্পে আনন্দ প্রকাশ করেন।

যেদিন সন্ধ্যার সময়ে এই প্রস্তাব হইল, তাহার পরদিনই বিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল এবং শীঘ্র বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিবার দিন মজুর পাওয়া গেল না। কিন্তু লোকাভাবে কার্য্যারম্ভ স্থগিত রহিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই সহোদরদিগকে সঙ্গে লইয়া মৃত্তিকা খনন কার্য্য আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া গেল। ৫।৭ দিনের মধ্যেই শতাধিক বালক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহের শ্রমজীবি, রাখাল ও কৃষক বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। সকলেই সর্ব্বত্র বিনা বেতনে ও বিনা ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণের পুস্তক, কাগজ, কলম, শ্লেট, পেন্‌সিল প্রভৃতিতে মাসে মাসে প্রায় তিনশত টাকার অধিক ব্যয় হইত। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন ও অন্যান্য খরচ সর্ব্বসমেত ৩।৪ শত টাকা পড়িত। প্রথম প্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই এই ব্যয়ভার বহন করিতেন। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত সেই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় "**ভগবতী বিদ্যালয়**" নামে অভিহিত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বীরসিংহ অঞ্চলে ভাল ডাক্তার পাওয়া যাইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকগণকে নিজ ব্যয়ে কলিকাতায় রাখিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া

জন্মস্থান বীর্বসিংহের ও তন্নিকটবর্ত্তী বহুতর স্থানের লোকমণ্ডলীর এই গুরুতর অভাব মোচন করেন। এই বিদ্যালয়ের অনেক উৎকৃষ্ট ছাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া শেষে সম্মান ও সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখনই যেথানে গিয়াছেন, সে স্থানের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের দ্বারা কিছু কিছু সদনুষ্ঠান সাধন করাইয়াছেন। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্যেই তাঁহার লোক হিতৈষণা জনসমাজের অজ্ঞতা দূরীকরণেচ্ছা এবং মানব সাধারণের উচ্চতর অধিকার লাভের পক্ষপাতিতা তাঁহার সুবৃহৎ জীবনের সুদৃঢ় ভিত্তিরূপে কার্য্য করিয়াছে। অধ্যাপক ব্রাহ্মণ কিরূপ সংযত, নির্লোভ, পরহিতাকাঙ্ক্ষী ও লোকবৎসল হইলে আমাদের এত অধঃপতন সহজে নিবারিত হইত, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার আদর্শ স্থল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে ও উদ্যমের ফলস্বরূপ মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসনের (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারে তাঁহাকে বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কোনও বাধাকেই গ্রাহ্য না করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত সেই মেট্রপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশন বর্ত্তমানে বহু কলেজের পিতৃস্থানীয়।

তের

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র পরিণয় পাশে আবদ্ধ হন। বিবাহে তাঁহার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সূচনা হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘকালের মধ্যে প্রথম চৌদ্দ বৎসর নিরতিশয় অশান্তির মধ্যে কাটিয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, বাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নবীনা বধূর সন্তানাদি না হওয়াতে পরিবারের সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে কালাতিপাত করিয়াছিলেন এবং যে কোনও লোক যখনই কোনও ঔষধাদির কথা বলিয়াছে, প্রবীণারা তাহাই বধূমাতাকে খাওয়াইয়াছেন। পরিশেষে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসের শেষ দিবসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই পিতার একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র। তৎপরে ক্রমান্বয়ে চারিটি কন্যার জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠা হেমলতা, মধ্যমা কুমুদিনী, তৃতীয়া বিনোদিনী, কনিষ্ঠা শরৎকুমারী।

বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় মাতৃপিতৃবৎসল ছিলেন। জনক জননীকে সুখী করাই তাঁহার জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য ছিল। নিজের নানাবিধ সুখের চিন্তাকে তিনি মাতাপিতার তৃপ্তি বিধানের জন্য অবাধে বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার মাতাপিতাকে চিরদিন দেবতাবোধে পূজা করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহকর্ত্তারূপে গৃহের ও অভিভাবকরূপে প্রতিবাসিগণের

তাবৎ কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আর জননী ভগবতী দেবী গৃহিণীরূপে পরিবারবর্গের ও আত্মীয়রূপে প্রতিবাসিগণের সেবা-শুশ্রূষায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় অবস্থান করিয়া কাজকর্ম্ম করিতেন এবং একান্নবর্ত্তী পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্য যখন যত টাকার আবশ্যক হইত তাহা সরবরাহ করিতেন। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, কখন কখন জননী, পত্নী ও পুত্রকন্যাসহ কলিকাতায় বাস করিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের স্ত্রীর ও পুত্র কন্যার সেবা অপেক্ষা অপর দশজনের সেবাই অধিক করিয়াছেন। কোনও প্রয়োজন কিংবা অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ীতে গেলে পরিবারবর্গের অপেক্ষা প্রতিবাসিবৃন্দের ও অপরিচিত বিপন্ন গ্রাম্য লোকদিগের অধিকতর আনন্দ হইত। কারণ তাহারা স্ব স্ব অভিপ্রেত সাহায্য পাইয়া অসুবিধা ও বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন যেখানে থাকিতেন, সেখানে ঔষধ, নূতন কাপড়ের বস্তা আর চক্‌চকে টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি ও পয়সা সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকিত। দরিদ্রজনের তিনটি অভাব—ঔষধ, অন্ন ও বস্ত্র ; লোকের এই অভাব মোচনে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত সর্ব্বদা মুক্ত ভাবে অপেক্ষা করিত।

বীরসিংহ ও তৎসন্নিহিত পল্লী সমূহের কুটীরে এইরূপ ধন বিতরণের সংবাদ প্রচারিত হইলে একবার তথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবস্থানকালে কতকগুলি দুষ্ট লোক সমবেত হইয়া

তাঁহার বাটীতে ডাকাতি করে। দস্যুদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহে অনেক টাকা আছে। বাটীতে সে সময়ে অনেক লোক। রাত্রি দ্বিপ্রহরে দলবদ্ধ দস্যুগণের সমাগমে সকলেই ভয়ে জড়সড়। ৪০।৫০ জন লোক সদর দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল দেখিয়া সকলেই পশ্চাদ্দার দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। মাতাপিতা ও পরিবার পরিজনসহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ও পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। দস্যুরা তাঁহার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল, পাইলে কিছু টাকা আদায় করিত। তাঁহাকে না পাইয়া দস্যুরা অবশেষে গৃহের সমুদয় দ্রব্য অপহরণ করিয়া লইয়া যায়।

বীরসিংহ গ্রামে অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পাঠশালা উঠিয়া যায়। ঐ সকল পাঠশালার গুরুমহাশয়গণ উদরান্নের জন্য নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আপনাদের বিপদের কথা জানাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় শৈশবের গুরুমহাশয়কে নিজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে নিম্নশ্রেণীর বালকগণকে বর্ণপরিচয় পড়াইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। অপর সকলকে পূর্ব্ব উপার্জ্জন অপেক্ষা কিছু কিছু অধিক বেতন দিয়া অন্য কোনও স্থানে কাজ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভগবতী দেবী বড় সরল হৃদয়া রমণী ছিলেন। লোকের দুঃখ কষ্টের কথা শুনিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। তিনি নিরন্তর পরসেবাতেই কালাতিপাত করিতেন। তিনি দিবারাত্র জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে গ্রামের হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্ন

শ্রেণীর লোকদের বাড়ীতে পীড়িত লোকদের পথ্যের ব্যবস্থা করিতে, তাহাদিগকে ঔষধ খাওয়াইতে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাকে সন্ধান করিতে যাইয়া দেখা যাইত যে, তিনি কোনও অস্পৃশ্য জাতির দ্বারে বসিয়া সে বাড়ীর রোগীর পথ্যের বা ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন। অনেক সময়ে সাগু ও মিছরি সঙ্গে থাকিত, যাহাদের রাঁধিবার লোক না থাকিত, নিজে বাড়ী আসিয়া তাহাদের জন্য পথ্য রাঁধিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপে অতিথি-অভ্যাগত ও দরিদ্রের সেবা করিতেই তাঁহার দিবসের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত।

একবার বাড়ীর সকলের ব্যবহারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ছয়খানি লেপ প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী লেপ কয়খানি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। জননীর নিজের ব্যবহারের জন্য এবং বাটীর অন্য কাহারও কাহারও জন্য সেগুলি আসিয়াছিল। ভগবতী দেবী প্রতিবেশি-গণের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন, তাহারা শীতে বড় কষ্ট পাইতেছে,—এমন শক্তি নাই যে শীত নিবারণের উপযোগী বস্ত্রাদি ক্রয় করে। সেই দরিদ্র গৃহস্থকে একখানি লেপ দিয়া অবশিষ্ট কয়খানিও শেষে এইরূপ নিতান্ত দরিদ্র ও শীতক্লিষ্ট লোকদিগকে দান করিয়া তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিলেন,—"ঈশ্বর! তোমার প্রেরিত লেপ কয়খানি শীতে বিপন্ন লোকদিগকে দিয়া ফেলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারের জন্য লেপ পাঠাইয়া দিবে।"

তদুত্তরে পুত্র জননীকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "ঐরূপ

ভাবাপন্ন লোকদিগকে এবং বাড়ীর লোকদিগকে দিয়া তোমার নিজের জন্য একখানি লেপ রাখিতে হইলে, সর্ব্বসমেত কয়খানি লেপ পাঠাইতে হইবে জানাইও। তোমার পত্র পাইলে আবশ্যকমত পাঠাইব।”

ঠাকুরদাস শেষ বয়সে কাশীবাসী হইবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল না যে, এই বৃদ্ধবয়সে আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পিতা একাকী যাইয়া কাশীতে বাস করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতাকে এই সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঠাকুরদাস কিছুতেই স্বীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সুখে স্বচ্ছন্দে কাশীবাসের ব্যবস্থা করিয়া পিতাকে কাশীতে পাঠাইয়া দিলেন। ঠাকুরদাস জীবনের অবশিষ্ট কাল পরম সুখে কাশীতে অবস্থান করিয়া শেষে বারাণসী ধামেই দেহত্যাগ করেন।

পিতাকে কাশীতে পাঠাইবার পর হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে একটা স্থায়ী বিষাদের রেখাপাত হয়। তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণভাবে সময়াতিপাত করিতেন। অনেক সময় বৃদ্ধবয়সে পিতার দূরদেশে অবস্থানের জন্য একাকী অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। কোনও প্রকার অসুবিধা বা পীড়ার সন্দেহ তাঁহার মনে উদয় হইলেই, হয় নিজে যাইতেন, না হয় তাঁহার সাহায্যের জন্য কাহাকেও পাঠাইয়া দিতেন। কোন দিন কোন কারণে এক মুহূর্ত্তের জন্য মাতাপিতার সুখ সাধনে উদাসীন হন নাই।

বহুপরিবারে একত্র বাস নিতান্ত অপ্রীতিকর ও অশান্তি-জনক বিবেচনা করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরদের সকলের পৃথক্ পৃথক্ গৃহ নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করেন। সকলে একত্র মারামারি কাটাকাটি না করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বাস করিয়া পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তা ও সমবেদনা রক্ষা করিয়া চলা অশেষ গুণে মঙ্গলকর মনে করিতেন; তাই অশান্তির স্থানে শান্তি স্থাপনে অভিলাষী হইয়া সকলের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দরিদ্র ও অসহায় বিদ্যার্থী বালকগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও তিনি কিছুতেই পারিবারিক শান্তি স্থাপনে সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই।

এইরূপে পারিবারিক বিবিধ অশান্তির মধ্যে যখন তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা বিনষ্ট হইতেছিল, সেই সময়ে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র মাসের রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আগুন লাগিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বীরসিংহের পৈতৃক বাসভবন ভস্মীভূত হয়। সেই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহে গমন করেন। সকলের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি জননীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিতে চাহিলেন। কিন্তু জননী দরিদ্র, নিরাশ্রয় বিদ্যার্থী বালকগণের বিপদ ও ক্লেশের উল্লেখ করিয়া প্রতিবেশীদিগের দুঃখ-কষ্টের দোহাই দিয়া, অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া কলিকাতায় আসিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন

এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের সুখ চিন্তা করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় সহোদরদিগের কাহাকেও পরিজনসহ কোন দিন ক্লেশ পাইতে হয় নাই।

গৃহদাহের পর যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ী গিয়াছিলেন, সেই সময় গ্রামের কেহ কেহ তাঁহাকে ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী প্রস্তুত করাইতে অনুরোধ করেন। তখন তিনি স্বাভাবিক হাসিভরা মুখে বলিলেন, "গরীব বামুনের ছেলের পাকা বাড়ী, লোকে শুনলে হাসবে যে! কোন রকমে মাথা রাখবার একটু স্থান হলেই হবে।"

সখের জিনিষ ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি কখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে স্থান পাইত না। লোককে দিবার সময় ভাল কাপড়, ভাল খাবার, বাজারের বাছা বাছা জিনিষ আনিতেন; কিন্তু নিজের বেলায় থান ধুতি, মোটা চাদর, চটি জুতা, সামান্য আহার,—এই সকলেই সন্তুষ্ট! তিনি সমগ্র জীবনে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, অন্যের হইলে সে ব্যক্তি বাংলা দেশে ধনবান্ লোকসমাজে গণনীয় ব্যক্তি হইত। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বোপার্জ্জিত ধনরাশি দরিদ্রের সেবায় ব্যয় করিয়া নিজে দরিদ্রের ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছেন।

একবার বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী জেলার কোনও এক গণ্ডগ্রামে গমন করেন। এই ঘটনার বহু পূর্ব্বে তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠিত নাম পল্লীগ্রামের প্রান্তরে রাখাল বালকগণের কণ্ঠে কণ্ঠে নিনাদিত হইয়াছে। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা, বৃদ্ধা, বালিকা ও যুবতী সকলেই বিদ্যাসাগরের

মূর্ত্তি দেখিবার জন্য লালায়িত। বেলা দশটা হইতে বিদ্যালয়ের নিকটবর্ত্তী গৃহসকল স্ত্রীলোকে পূর্ণ হইয়া গেল। গৃহের জানালায় দ্বারের পার্শ্বে, ছাদের উপর, এমন কি, প্রবীণারা পথের ধারে দণ্ডায়মানা। বিদ্যাসাগর আসিবেন আসিবেন করিয়া বহু বিলম্ব হইয়া গেল। যাহারা ছাদে ও পথের ধারে সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হইতেছিল, তাহাদের কষ্টের সীমা রহিল না। এমন সময়ে একটা সরগোল উঠিল, 'বিদ্যাসাগর আসিতেছেন।' চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। মেয়েরা যে যেখানে ছিল, সেইখান হইতে অবগুণ্ঠন ফাঁক করিয়া বিদ্যাসাগরকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। বিদ্যাসাগর আসিলেন, সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু মেয়েরা অনেকে তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। এক প্রবীণা অগ্রসর হইয়া একজন পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা, বিদ্দেসাগর কই? তিনি কি এলেন না?"

বৃদ্ধা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, "আ আমার পোড়া কপাল! এই মোটা চাদর গায়ে উড়ে বেয়ারা দেখিবার জন্য রোদে ভাজা ভাজা হইলাম! না আছে গাড়ী, না আছে ঘড়ী, না আছে চোগা চাপকান!"

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী, পুত্র ও সহোদরগণের দ্বারা সংসার-জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। কেবল যে সুখী হইতে পারেন নাই, তাহা নহে, অনেক স্থলে নিতান্ত অসুখী হইয়া মনের কষ্টে দিন কাটাইয়াছেন, কিন্তু এই সকল অশান্তিকর

ব্যাপারের মধ্যে তিনি কাহারও সুখসাধনে বিমুখ ছিলেন না। তিনি যাহাদের আচরণে ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত, তাহাদেরই সেবায় ও সুখসাধনে চিরজীবন নিযুক্ত। কেবল একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র নিজ দোষে দীর্ঘকাল পিতার স্নেহ ও মমতায় বঞ্চিত ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই জীবনব্যাপী বিবিধ প্রকারের দুঃখকষ্টের মধ্যে দুই একটি সুখের বিষয় ছিল। শেষ দশায় তিনি যখন কলিকাতায় কন্যাগুলিকে লইয়া বাদুড়বাগানের বাড়ীতে বাস করিতেন, তখন তাঁহার বালক দৌহিত্রেরা তাঁহার পরম আরামের স্থল হইয়াছিল। এক এক দিন সন্ধ্যার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বসিবার ঘরে পরিবারস্থ সকলে মিলিত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় সকলকে লইয়া গল্প করিতেন। মধ্যে মধ্যে সকলেই চর্ব্বিত তাম্বূলের উমেদার হইতেন। সকলকে একসঙ্গে দেওয়া সম্ভব হইত না, তাই পর্য্যায়ক্রমে পরে পরে সকলকে পান দিতেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ দৌহিত্র গুজে (রামকমল) তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাকে উপহার দিবার জন্য নূতন সিকি, দুয়ানী, আধুলী ও টাকা সর্ব্বদাই নিকটে রাখিতেন। বালক চাহিবামাত্র তাহাকে দিতেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "দাদু, তুমি কাকে ভালবাস?" শিশু বলিত, "দাদা মশাই, তোমাকেই খুব ভালবাসি, আর তোমার চেয়ে তোমার ঐ নূতন নূতন সিকি দুয়ানীকে বেশী ভালবাসি।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, "সকলেই তাই করে, তবে তুমি বোঝ না তাই ব'লে ফেল, অন্যেরা ওকথা স্বীকার করে না।"

চৌদ্দ

আত্মীয় স্বজন সকলের নিকট বিদায় লওয়ার পর যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত চিত্তে নির্জ্জন বাস সম্ভোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার জননী কাশীবাসের জন্য স্বামীর নিকট গমন করেন। কিন্তু কাশীবাস তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় শেষে তিনি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বীরসিংহে প্রত্যাগমন করেন। আসিবার সময় কাশী হইয়া আসেন। সেখানে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বাড়ী আনিবার জন্য অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু ঠাকুরদাস তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কাশীতেই থাকিতে চাহিলেন এবং গৃহিণীকেও তথায় থাকিতে বলিলেন। ভগবতী দেবী স্বামীর কথার উত্তরে বলিলেন, "তোমার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। আমি যেখানেই থাকি, এই কাশীতে আসিয়া তোমার আগে মরিব। আমার পর তুমি যাইবে। তাই বলিতেছি, এখনও বিলম্ব আছে, বাড়ী চল।"

ভগবতী দেবী যাহা বলিয়াছিলেন, দৈববাণীর মত তাহাই ঘটিয়াছিল। ঠাকুরদাস পীড়িত হইয়া আসন্নকাল সন্নিকট বোধে কলিকাতায় ও বীরসিংহে সংবাদ দেন। তদনুসারে দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র জননীকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাত্রা করেন। ওদিকে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পিতার পরিচর্য্যার জন্য কাশী যাত্রা করিলেন। উপযুক্তরূপ সেবা-শুশ্রূষা ও ঔষধাদির সুব্যবস্থায় ঠাকুরদাস আরোগ্য লাভ করিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র জননী ও সহোদরদিগকে পিতার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

ঠাকুরদাস ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু ভগবতী দেবী দুই মাস কাশীবাস করিয়া বৎসরের শেষ দিনে বিষম বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন।

জননীর মৃত্যু সংবাদে ঈশ্বরচন্দ্র নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মাতৃহীন বালকের মত সর্ব্বদাই রোদন করিতেন। জননীর মৃত্যুকালে নিকটে থাকিতে ও সেবা করিতে পারেন নাই বলিয়া নিরতিশয় ক্ষুব্ধচিত্তে সর্ব্বদাই কালাতিপাত করিতেন। কাশীপুরে গঙ্গাতীরে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া এক বৎসরকাল সর্ব্বপ্রকার সুখ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে স্বহস্তে পাক করিয়া একাহার ও নিরামিষ ভোজনে দিন যাপন করিতেন। এক বৎসরের জন্য, জুতা, ছাতা ও কোমলশয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি দীন দুঃখীর ন্যায় কায়-ক্লেশে দিন কাটাইতেন। তিনি দীর্ঘকাল জননীর শোকে অতি বিমর্ষ ভাবে নির্জ্জনে বাস করিয়াছেন। মাতৃভক্ত ঈশ্বর-চন্দ্র তগ্দতচিত্তে জননীর গুণাবলী ধ্যান করিতেন। জননীর লোকান্তর গমনের দীর্ঘকাল পরেও প্রসঙ্গপ্রমে তাঁহার পরমারাধ্যা গুণময়ী জননীর গুণের উল্লেখ করিতে করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বর্ষণ করিতেন।

মাতৃশোকের সংবরণ হইতে না হইতে আর এক ভীষণ দুর্ঘটনায় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বিদ্যাসাগর মহাশরের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ পরম স্নেহা-

স্পদ জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বিসূচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় দীর্ঘকাল হতাশ ও বিষণ্ণভাবে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। এই দুঃখকষ্টপূর্ণ সংসারের সর্ব্ববিধ ক্লেশ ও অসুবিধাকে বরণ করিয়া লইয়া কন্যার কোমল প্রাণে যে ক্লেশ হইয়াছিল, সহৃদয় পিতা নিজে তাহার অংশ গ্রহণ করিয়া জনসমাজ সমক্ষে পারিবারিক জীবনের উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কন্যা যখন নিরামিষ ও একাহারে প্রাণধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি স্বাভাবিকভাবে মৎস্য ত্যাগ করিলেন ও রাত্রির আহার কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখিলেন। যখন আহারে বসিতেন, দুঃখিনী বিধবা কন্যার কঠোর জীবন যাপনের কথা মনে হইত, আর আহারে তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিতেন না। কন্যা মৎস্য ত্যাগ করিয়াছেন, এই চিন্তার দুঃসহ জ্বালায় তিনি মৎস্যাদি মুখে তুলিতে পারিতেন না। রাত্রিতে আহারের সময় কন্যা উপবাসিনী, এই চিন্তাই তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণা আপনি লোপ করিয়া দিত। কিছুদিন পরে এই কন্যাই বহু সাধ্যসাধনা করিয়া পিতার নিরামিশ ভোজন ও একাহারের নিবারণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

কাশীতে জননীর মৃত্যু হওয়াতে ঈশ্বরচন্দ্র দীর্ঘকাল আর কাশী যাইতে সম্মত হন নাই। পিতা ঠাকুরদাস বহুকাল পুত্রের মুখোবলোকনে বঞ্চিত, তাই পুত্রকে একটিবার একদিনের জন্য কাশী যাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পত্র পাওয়া মাত্র পিতৃচরণ দর্শন করিববার জন্য কাশী যাত্রা করেন। কয়েকদিন পিতার নিকট থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সুখ ও সুবিধা সাধন করিয়া পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

সন ১২৮৩ সালের ১লা বৈশাখ সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুরদাস দুঃখকষ্টময় সংহারের ভার উপযুক্ত পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া পরিজন ও পুত্র পৌত্রগণের ক্রোড়ে দেহত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুতেও ঈশ্বরচন্দ্র অনাথ বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে সমাপনান্তে তিনি স্নান তর্পণাদি শেষ করিয়া বাসায় ফিরিয়া মাতাপিতার শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সুপণ্ডিত, জ্ঞানী ও সুপ্রবীণ বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরজীবন মাতাপিতার সর্ব্ববিধ সুখসাধনে পরম তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন। মাতাপিতার অনুগত হইয়া চলাই তাঁহার পরম ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান ছিল এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে সর্ব্বদা দেবতাবোধে মাতাপিতার সেবা করিয়াছেন।

মানসিক উদ্বেগ ও উত্তেজনায় পিতার মৃত্যুর পরদিন প্রাতঃকাল হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল; তাঁহারও বিসূচিকা রোগের লক্ষণ দেখা দিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই নিতান্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল। অনেকে সেইদিনই কাশী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিবার পরামর্শ দিল। অবশেষে সকলের পরামর্শমত সেই রাত্রেই কলিকাতায় আসা স্থির হইল। কলিকাতায়

আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিলেন। যথাসময়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুকাল অতি নিভৃতভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সহজে কোথাও কোন কার্য্যে লিপ্ত হইতেন না। অধিকাংশ সময়ে নির্জ্জন বাসেই কালযাপন করিতেন। নির্জ্জন বাস-কালে জ্ঞানচর্চ্চা ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলনই তাঁহার জীবনের শেষভাগের প্রধান কার্য্য হইয়াছিল।

শরীরের অবস্থা দিন দিন নিতান্ত মন্দ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি উইল দ্বারা নিজের সম্পত্তি ও তাহার আয় দ্বারা কিরূপ ব্যয় হইবে তাহার ব্যবস্থা করেন।

আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব এবং মৃত আত্মীয় ও বন্ধুদিগের পরিবারবর্গের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার উইলে যে মাসিক দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার মোট সমষ্টি ৫৬১৲ টাকা, আর বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৪৫।

তিনি ১২৮৩ সালের শেষ ভাগে বাদুড়বাগানে নিজের নির্ম্মিত নূতন বাড়ীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের পরম প্রিয় পুস্তকালয়টিকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া মনের দীর্ঘকালস্থায়ী দুঃখ দূর করিলেন। পুষ্পোদ্যান-পরিশোভিত নির্জ্জন ক্ষুদ্র বাটীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ আনন্দ এই ছিল যে, একাকী বসিয়া লেখাপড়া করিবার বিস্তর অবসর পাইতেন এবং দিবারাত্র কোন না কোন একখানি পুস্তক লইয়া জ্ঞান-চর্চ্চা বা শাস্ত্র পাঠ করিতে ভালবাসিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুমণ্ডলী উল্লেখযোগ্য। বন্ধুদিগের কাহারও কাহারও দ্বারা সময়ে সময়ে ক্লেশ পাইলেও তাঁহার বন্ধুমণ্ডলী পরম গৌরবের স্থল। এইরূপ দুর্ল্লভ বন্ধুজন পরি-বেষ্টিত হইতে পাওয়া পরম সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুত্ব মুখের কথায় বা চিঠিপত্রে আবদ্ধ থাকিত না। তিনি বন্ধুদিগকে সকল অবস্থায় সংবাদ রাখিতেন, তাঁহাদের বিপদে মাথা পাতিয়া দিতেন, বন্ধুসেবায় কোনও ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া মনে করিতেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাগ্মীপ্রবর স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বাবুর সহিত অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বন্ধুত্বের প্রগাঢ়ত্ব জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। ইংলণ্ডে সুরেন্দ্র নাথের সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষার সময় বয়স লইয়া গোলযোগ বাঁধিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই উদ্যোগী হইয়া মাননীয় জজ দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া এখান হইতে বয়সের প্রকৃত বিবরণ প্রেরণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন। পুনরায় যখন অন্যবিধ দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া সুরেন্দ্রনাথের অতি সাধের সিভিলিয়ানী সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল, তখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সুরেন্দ্রনাথকে সাদরে নিজের মেট্রপলিটন কলেজে অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের গৃহে এক ভয়ানক পারিবারিক দুর্ঘটনা উপলক্ষে বিদ্যাসাগর

মহাশয়ই জনে জনে স্ত্রী পুরুষ সকলের মুখে জল দিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ বাবুর তরুণ বয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি অল্প বয়সে বিধবা হন। এই নিদারুণ বিপৎপাতে গৃহের সমগ্র পরিজনবর্গ যখন ধরাশায়ী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তখন একাকী সকলকে শান্ত করিয়াছেন, ভূশয্যা হইতে উঠাইয়া মুখে সরবতের বাটী ধরিয়াছেন; যতদিন পরিবারের প্রত্যেকে একটু সবল না হইয়াছে, ততদিন প্রত্যহ নিকটে থাকিয়া নানা উপায়ে প্রত্যেকের চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন।

এক সময়ে বারাসত নিবাসী কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁহাকে দীর্ঘকালের জন্য ভাগরথীবক্ষে নৌকাবাসে কালযাপন করিতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় অকৃত্রিম সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য তাঁহার সঙ্গে দীর্ঘকাল ভাগরথী-বক্ষে বাস করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুদিগের মধ্যে কায়স্থ পরিবারের কোনও এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহিণী তাঁহাকে পিতৃসম্বোধন করিতেন। কিন্তু এই রমণী উন্মাদিনী ছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে আহার করাইতে পারিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় একসময়ে একাদিক্রমে ছয়মাস যাবৎ বেলা দশটার সময় সেই কন্যা স্থানীয়া মহিলাকে আহার করাইতে গিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুপ্রীতির এইরূপ বহু পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সামাজিক জীবনে, বড়ই মধুর প্রকৃতির

লোক ছিলেন। আমোদ-প্রমোদে, আলাপ-পরিচয়ে রঙ্গ-রহস্যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। একবার একস্থানে কোনও আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়া জানিতে পারিলেন, গৃহ-কর্ত্তাকে দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন বর্জ্জন করিয়া তৎক্ষণাৎ নূতন আয়োজন করিয়া তবে সকলকে আহার করাইতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহকর্ত্তাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি, তুমি যত শীঘ্র পার সমস্ত আয়োজন কর, নিমন্ত্রিত সমাগতগণের ব্যস্ততা ও উদ্বেগ নিবা-রণের ভার আমি লইলাম।" সমস্ত নিমন্ত্রিত লোককে দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা প্রকার গল্পে এরূপ ভাবে আকৃষ্ট করিলেন যে, কেহই বেলাধিক্যের জন্য কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করিবার অবসর পাইলেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যাহারা কখনও দেখে নাই, এরূপ লোক যদি কখনও তাঁহাকে তাঁহার প্রতিদিনের কার্য্য-কলাপের মধ্যে দেখিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে নিতান্ত ব্যয়-কুণ্ঠ বলিয়া মনে করিত। কোথাও যাইতে হইলে সহজে গাড়ী বা পাল্কী ভাড়া করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সবল চরণ দুইখানির উপযুক্ত ব্যবহার করিতেন। একবার কোথাও যাবার সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়া ট্রেন না পাওয়াতে ফিরিয়া আসিতে হয়। যাইবার ও ফিরিবার সময় পাঁচ আনা দিয়া দশ আনা গাড়ী ভাড়া লাগে। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গাড়ী ভাড়া দিবার সময়ে দুঃখ করিয়া বলিলেন, "এই দশ আনা মিথ্যা মিথ্যা গেল।" নিকটে যাহারা ছিল

তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কথায় হাসিয়া উঠিল। হাসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিতেছ কেন ?"

উপস্থিত ব্যক্তিগণের একজন বলিল, "এমন কত দশ আনা যাইতেছে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "এইরূপ অপব্যয় ?"

লোকটি বলিল, "কেন কত লোক আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়া কত টাকা লইয়া যাইতেছে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সেই সরল মুখ ভঙ্গিমায় উত্তর করিলেন, "তাহাকেই বুঝি অপব্যয় বলে ? সে ত একজনকে হাতে তুলিয়া দিলাম, আর কিছু না হউক, যে পাইল সে উপকার বোধ করিল ত ? আর এ যে 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়', যে ব্যক্তি পাইল, সে তাহার পারিশ্রমিক বলিয়া লইল, আর আমি দিলাম বটে, কিন্তু আমার কোন উপকারে আসিল না !"

বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনও জিনিষ ফেলিয়া দেওয়া, অপব্যয় করা বা নষ্ট করার, মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। কোথাও হইতে কোনও দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহার মোড়কের কাগজ ও দড়িগুলি অতি যত্নের সহিত তুলিয়া রাখিতেন। কোথাও হইতে পত্রাদি আসিলে তাহার অলিখিত সাদা অংশটুকু কাটিয়া লইতেন এবং এইরূপ ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড টেবিলের এক প্রান্তে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। প্রয়োজনমত ক্ষুদ্র পত্রাদি লিখিতে ও প্রেস-কপি প্রস্তুত করিতে ঐ সকল কাগজখণ্ড ব্যবহার করিতেন।

একদিন এক পরিচারিকা রন্ধনের বাটনা বাটিতে শিলধোয়া হলুদের জলটুকু ফেলিয়া দিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সস্নেহস্বরে বলিলেন, "বলি ও কি হলো? হলুদের জলটা ফেলে দিলে? সেই পরিচারিকা অবাক্ হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া একটু রহস্যের স্বরে বলিল, "দাদামশাই-এর কত টাকা আছে, সে দিকে নজর নাই, আর এই হলুদের জলটুকুতে চোখ পড়েছে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "দেখ, হলুদের জলটুকু তরকারিতে দিলে কাজে লাগতো ত, আমি ত আর টাকা জলে ফেলিয়া দেই না, লোককে দেই। ও জলটুকু নষ্ট হবে কেন?"

এই সকল সামান্য ঘটনাই তাঁহার গৃহকর্ম্মে নিপুণতা, অতি সামান্য দ্রব্যাদিও যত্নের সহিত রক্ষা করার অভ্যাস এবং ব্যয় বিষয়ে সমদর্শিতার উৎকৃষ্ট পরিচয় স্থল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতেন বলিয়াই তিনি বৃহৎ ব্যাপারে, মহদনুষ্ঠানে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও কুণ্ঠিত হইতেন না।

পনেরো

এইবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরাট লোক-সেবা বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

শৈশব হইতেই বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে পরোপকার প্রবৃত্তি স্থান পাইয়াছিল। তিনি পাঠদ্দশায় নিজের বাড়ীর চরখা-কাটা মোটা সূতায় প্রস্তুত গুণ চটের মত অনতিদীর্ঘ ও অপ্রশস্ত বস্ত্র খণ্ডে কায়ক্লেশে নিজের লজ্জা নিবারণ করিয়া নিজের ছাত্র বৃত্তির টাকায় গরীব সহপাঠীদিগকে ভদ্রোচিত সুন্দর বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন। কর্ত্তব্য সাধনের জন্য—লোকহিত সাধনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় অবলীলাক্রমে নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার সুবিস্তৃত জীবনে নানা ঘটনার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ের সমপাঠীদিগের অভাব মোচন করিতে, তাহাদের পীড়াতে চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে এবং আয়োজন হইলে তাহাদের সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। বাল্যকাল হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি যে কত শত রোগীর শয্যা পার্শ্বে যামিনী যাপন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। দুরন্ত বালক এইরূপে ক্রমে সহৃদয় ও সেবাপরায়ণ যুবকে পরিণত হন, সহৃদয় ও সেবাপরায়ণ যুবক ক্রমে এক বিশ্বব্যাপী উদারতার চরম আদর্শে পরিণত হইয়াছিলেন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ও ৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে

বঙ্গের অমর কবি মধুসূদন দত্ত যখন ফরাসী দেশের অন্তর্গত ভার্সেলিস নগরে নানা বিপদে আক্রান্ত হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন, যখন তাঁহার বঙ্গীয় সুহৃদ্‌গণ তাঁহার অনটন, অনশন ও পরিশেষে তাঁহার কারাবাসের সম্ভাবনা-সংবাদেও নিরুদ্বেগে সুনিদ্রা-সুখ সম্ভোগ করিতে ছিলেন, পুনঃ পুনঃ সংবাদ আসিলেও ভারপ্রাপ্ত সুহৃদ্‌মণ্ডলী যখন কোনও তত্ত্ব লইলেন না, বিলাত গমনকালে সর্ব্বপ্রকার ভার গ্রহণ করিতে আশ্বাস দিয়া শেষে যখন পত্রের উত্তর দিতে পর্য্যন্ত তাঁহারা বিমুখ হইয়া পড়িলেন, তখন তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মধুসূদন নিজের বিপদের প্রকৃত গুরুত্ব অনুভব করিয়া বন্ধুগণের ব্যবহারে ভগ্নহৃদয় হইয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। নিরবচ্ছিন্ন নিরাশার ঘন অন্ধকার যখন তাঁহার গভীর চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিল, তখন সেই অন্ধকার পথে তড়িতালোকে কোন্ মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল? সেই প্রবাসী মধুসূদনের বিপদের অন্ধকার ভেদ করিয়া কোন্ মহাপুরুষের মধুর মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়প্রান্তে উদিত হইয়া আশার সঞ্চার করিয়াছিল? সে মধুর মূর্ত্তি আর কাহারও নহে, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি!

মধুসূদন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে যে দীর্ঘ পত্রখানা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এইরূপ—

"আমার ৪০০০৲ স্বদেশে পাওনা, তবু আমি অর্থাভাবে এদেশীয় কোন কারাগারে যাইতেছি, আর আমার স্ত্রী ও

সন্তানেরা কোন অনাথাশ্রমে আশ্রয় লাভ করিতে বাধ্য হইবে।

"যে দুরবস্থার মধ্যে আমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছি ইহা হইতে উদ্ধার করিতে আপনি একমাত্র সুহৃৎ এবং ইহা সম্পন্ন করিতে হইলে যে বিশাল কর্ম্ম-নৈপুণ্যের প্রয়োজন, তাহা আপনারই অন্তরে দৃঢ়তা ও প্রতিভার নিত্য সহচর। একটি দিনও বিলম্ব করিলে চলিবে না।"

এই পত্র পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসীম দুর্ভাবনার আর কূল-কিনারা রহিল না। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসচ্ছলতার মধ্যভাগ। তিনি নিজে সেই সময় ঋণজাল জড়িত, অভাব ও অনটনের মধ্যে বহুকষ্টে দিন যাপন করিতেছিলেন। সামান্য অর্থ পাইলে, তাঁহারই আর্থিক কষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারিত। এইরূপ দুর্দ্দিনে প্রবাসী মধুসূদনের দারিদ্র্য ও তন্নিবন্ধন সমূহ বিপদের আশঙ্কা অবগত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ মধুসূদনের বন্ধুগণের আচরণের কথা অবগত হইয়া আরও ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি মধুসূদনের বন্ধুগণের নিকট ও নানাস্থানে চেষ্টা করিয়াও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া নিজের ঋণ বৃদ্ধি করিয়া মধুসূদনের উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হইলেন। বহুকষ্টে পরবর্ত্তী ডাকে ১৫০০৲ টাকা মধুসূদনকে পাঠাইলেন এবং অর্থ প্রাপ্তিমাত্র ইংলণ্ডে গমন করিয়া নিজের প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পরামর্শ দিলেন।

মধুসূদনের বন্ধুগণের নিকট টাকার কোনও কিনারা করিতে না পারিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। মধুসূদনকে আরও অনেক টাকা পাঠাইতে হইল। কিন্তু তন্তুকীট যেমন আপন লালা নির্ম্মিত কোষ মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করে, তেমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় ঋণের দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া তাহাতে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের আর কোনও উপায় রহিল না। গুটিপোকা যেমন আত্মবিনাশ করিয়া জনগণের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তদ্রূপ আত্মবিনাশ করিয়া মধুসূদনের কল্যাণ সাধন করিতে লাগিলেন।

মধুসূদন ইংলণ্ডে অবস্থান কালে কিংবা এদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কোনও দিনই বিদ্যাসাগরকে ঋণ দায় হইতে মুক্ত করিতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই সেই ঋণ ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতে হইয়াছিল।

সন ১২৭২ সাল। অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ঐবৎসরের শেষ ভাগে, বিশেষতঃ ১২৭৩ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় প্রভৃতি কয়েক মাস এদেশে যে ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার নহে। দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। পেটের জ্বালায় আকুল হইয়া বঙ্গসন্তানগণ বিশুষ্ক মুখে ও শীর্ণকলেবরে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল। চারিদিকে হাহাকারধ্বনি, এক মুষ্টি অন্নের জন্য স্ত্রী, পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধ লালায়িত। অন্নাভাবে

লতাপাতা ও বৃক্ষমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে করিতে অবশেষে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। উড়িষ্যা এবং বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরাই অধিক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এই দুর্দ্দিনে মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া দীন দুঃখীর ক্ষুধানল নির্ব্বাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধ ক্রমে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার নানাস্থানে সরকারী খরচে অন্নসত্র খোলা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন উঠে নাই। মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে লোকে অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে এবং বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকসকল অন্নাভাবে কাতর হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীর দ্বারে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে ; এই সংবাদ কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে পৌঁছিবামাত্র তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের জঠরানল নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ বাটী গমন করিলেন। তিনি যে অন্নসত্র খুলিয়া অকাতরে ৪।৫ মাস অন্নদান করিয়াছিলেন, তাহাতে অসংখ্য অন্নক্লিষ্ট লোক আসন্ন মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ১২ জন পাচক দিবারাত্র রন্ধন করিয়াছে, ২০ জন লোক অবিশ্রান্ত পরিবেশন করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস কাটিয়াছে।

প্রথম প্রথম ১০০।২০০ শত লোক খাইত। ক্রমে যখন অভাবের আগুন চারিদিকে পূর্ণমাত্রায় জ্বলিয়া উঠিল, তখন অন্নপ্রার্থী লোকের সংখ্যাও অগণ্য হইয়া পড়িল।

শেষে এমন হইল যে, দিবারাত্র অন্ন বিতরণ করিয়াও কূল পাওয়া গেল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সংবাদ পাইয়া সেখানকার ভারপ্রাপ্ত সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লিখিয়া পাঠাইলেন, "যতটাকা ব্যয় হয় হউক; কেহ যেন অভুক্ত না থাকে। সকলেই যেন খাইতে পায়।" এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই বাড়ী যাইতেন। একবার তিনি বাড়ী গেলে অন্নার্থী লোকেরা তাঁহাকে এই বলিয়া ধরিয়া বসিল যে, খিঁচুড়ী খাইতে খাইতে আহারে অরুচি জন্মিতেছে, মধ্যে মধ্যে এক একদিন চারিটি সাদা ভাত হইলে ভাল হয়। অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় সপ্তাহে একদিন অন্ন-ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই ভাতের ব্যবস্থার প্রথম দিনই একটি নিতান্ত হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা ঘটে। অন্নব্যঞ্জনের আয়োজনে এক ব্যক্তি হৃষ্টমনে ভাত খাইতে গিয়া, সেই শুষ্ক অন্ন মুখে দিয়া দম আটকাইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মৃত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে লইয়া বহুক্ষণ ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তাহার ভাত খাওয়া হইল না, আহার করিতে গিয়া বেচারা মরিয়া গেল, এই দুঃখ চিরদিন শক্তিশেলের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ ছিল।

নিম্নজাতীয় দরিদ্র লোকদিগের প্রতি পাছে কোন প্রকার অযত্ন হয়, এই আশঙ্কায় তিনি নিজে দুঃখী ও দুঃখিনীগণের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন। হাড়ি, ডোম প্রভৃতি নিম্ন জাতীয় লোকদের রুক্ষ মাথায় তৈল দিতে কেহই অগ্রসর

হইত না, তাই তিনি নিজ হাতে তৈল লইয়া তাহাদের মাথায় মাখাইয়া দিতেন।

এই সমগ্র দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের দারুণ হাহাকারে যখন চারিদিক নিনাদিত হইয়াছিল, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের অর্থব্যয়ে এবং রাজপুরুষদিগের সহায়তায় নানা প্রকারে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের জঠরানল নির্ব্বাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দীন-দরিদ্রজন তাঁহাকে এই সময় হইতে **দয়ার-সাগর** বলিয়া ডাকিতে শিখিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বাস্থ্যলাভের জন্য বর্দ্ধমানে যাইয়া কমলসায়ারের তীরস্থ বর্দ্ধমানাধিপতির একটি মনোরম অট্টালিকায় চারিমাস বাস করেন। এই উপবনের সন্নিকটে কতকগুলি দরিদ্র মুসলমানের বাস ছিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেই সকল দরিদ্র লোক তাঁহার আত্মীয় স্বজন মধ্যে—পোষ্যবর্গের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল। ঐ পল্লীর ছোট ছোট বালক-বালিকা তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিদিন তাহাদিগকে খাবার কিনিয়া দেন, তাহাদের মাতা পিতা প্রভৃতিরও নানা অভাব মোচন করিতে প্রবৃত্ত হন। অনেকের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবসায়াদি চালাইবার মত মূলধন দিয়াও স্থায়ী অন্ন সংস্থান করিয়া দেন। এইরূপে এই পল্লীর দরিদ্র লোক তাঁহাকে পরমাত্মীয় আপনার জন করিয়া লইল।

কার্ম্মাটারে অবস্থান কালে তথাকার দরিদ্র অধিবাসী সাঁওতালদিগের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

ইহারা অতি সরল প্রকৃতির লোক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মিষ্ট কথা ও দয়ামায়া দেখিয়া সেখানকার সমগ্র সাঁওতাল অধিবাসী তাঁহার আপনার লোক হইয়া পড়িল। তাহাদের রোগ হইলে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ দিতেন, বস্ত্রাভাবে বস্ত্র, অন্নাভাবে অর্থ দিতেন। এতদ্ভিন্ন থালা, ঘটী, বাটী যে যাহা চাহিত, তাহাকে তাহাই দিতেন। সাঁওতালদিগকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে, বর্দ্ধমান হইতে নানাবিধ মিষ্টান্ন ইহাদের জন্য লইয়া যাইতেন। পূজার সময় তিনি ইহাদের সকলকেই নূতন কাপড় দিতেন। ইহাদিগের মধ্যে ঔষধ বিতরণের জন্য সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণ ঔষধ ও শিশি মজুত রাখিতেন। কার্ম্মাটারের সাঁওতাল ও অন্যান্য দরিদ্র লোকদিগের শিক্ষা বিধানের জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুল করিয়া দিয়াছিলেন।

সাঁওতালগণ তাঁহাকে এত ভালবাসিত যে, তথায় তাঁহার গমন-সংবাদ প্রচারিত হইলে প্রাতঃসন্ধ্যা ইহারা তাঁহার পৌঁছিবার সংবাদ পাইবার জন্য অতি ব্যাকুল ভাবে অপেক্ষা করিত। প্রত্যেকবারই তাঁহার সহিত প্রথম দেখা করিতে আসিবার সময়ে যাহার যাহা থাকিত, তাঁহার জন্য উপহার লইয়া আসিত। তরকারী ও শাকসব্জীর ভাগই অধিক। এক ব্যক্তির কিছু না থাকায় যে একটা মুরগীর ছানা লইয়া আসিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার উপবীত দেখাইয়া বলিলেন, "আমি ত উহা লইব না" সেই ব্যক্তি মর্ম্মাহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরুপায়

হইয়া সেই কুক্কুটশাবক হাতে করিয়া লইলে পর সে ব্যক্তির মনঃক্লেশ দূর হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নিজে দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধানে ও অনুশীলনে একজন উপযুক্ত চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে যখন গিয়াছে, বিনামূল্যে ঔষধ পাইয়াছে।

দরিদ্র মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের উপকারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় **হিন্দুপারিবারিক বৃত্তি ভাণ্ডার** স্থাপন করেন।

একবার বর্দ্ধমান হইতে বীরসিংহে যাইবার সময়ে পথে একস্থানে পাল্কী নামাইলে পর একটি বালক নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। শিশুপ্রিয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িবামাত্র বালক বলিল, "বাবু, একটা পয়সা দিবেন?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক পয়সা কি কর্‌বি?" বালক উত্তর করিল, "কেন, খাবার খাব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "যদি দুই পয়সা দেই?" বালক উত্তর করিল, "আজ এক পয়সা খাব, কাল এক পয়সা খাব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি এক আনা দেই?" বালক উত্তর করিল, "হাটে আম কিনে গাঁয়ে বেচে দুই আনা করবো, লাভের পয়সা খাব, আসল পয়সায় ঐ রকম করে কেনা বেচা করবো।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বালকের কথায় খুসী হইয়া তাহাকে কিছু বেশী পয়সা দিয়া বলিয়া গেলেন, "এই পয়সা যদি তুই বাড়াতে পারিস, তোকে

টাকা দিয়া দোকান করিয়া দিব।” ফিরিবার সময় সেই বালক পয়সা হইতে টাকা করিয়াছে দেখিয়া তাহাকে দোকান করিয়া দেন, আর তাহার বিবাহে সমুদয় ব্যয়ভার বহন করেন।

দুঃখ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি লোকের সেবা, লোকের সুখ সাধন করিতে গিয়া পদে পদে হৃদয়ে ব্যথা পাইয়াছেন ; আর তাঁহার সেই শান্ত হৃদয়—সেই কোমল প্রাণ বারবার সন্তপ্ত ও দগ্ধ হইয়াছে। তিনি জীবনব্যাপী ক্লেশ পাইয়াছেন। কিন্তু কখনও লোকের দুঃখ নিবারণে বিমুখ হন নাই। মানুষের দুঃখের কথা শুনিলেই তাঁহার সরল প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইত। দয়া করিবার সময় তাঁহার পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকিত না।

মানুষ কেন, তাঁহার সরল প্রেমে পশুপক্ষীরাও বশ হইয়াছিল। বিহঙ্গকুলের মধ্যে কাক অতি ধূর্ত্ত বলিয়া বিদিত। এই কাকও তাঁহার ভালবাসার অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নিকটে দাঁড়াইয়া ইহাদিগকে যাহা দিতেন, ইহারা অসঙ্কোচে তাঁহার হাত হইতে তাহাই লইয়া খাইত। একবার ক্ষুদিরাম বসু মহাশয়কে বিদ্যাসাগর কমলা লেবু খাইতে দিয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম বাবু লেবু খাইয়া ছিবড়াগুলি ফেলিয়া দিতেছেন দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সেগুলি ফেলিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, “দেখ, ঐগুলি ফেলিয়া দিওনা! খাইবার লোক আছে।” তখন ক্ষুদিরামবাবু অবাক্ হইয়া বলিলেন, “কমলার ছিবড়া কে খাবে?” তখন বিদ্যাসাগর

মহাশয় বলিলেন, "জানালার বাহিরে ঐখানে রাখ, দেখিবে যাহারা খায়, তাহারা আসিবে।" ক্ষণকাল ঐরূপে রাখার পর কেহই আসিল না দেখিয়া ক্ষুদিরাম বাবু বলিলেন, "কই, কেহ ত আসিল না।" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "তোমার চোগা-চাপকানের জাঁকজমক দেখিয়া তাহারা আসিতেছে না, তুমি সর দেখি।"—এই বলিয়া তিনি নিজে গিয়া জানালার নিকটে দাঁড়াইবামাত্র অমনি চিরপরিচিতের ন্যায় কাকেরা আসিয়া তাঁহার প্রদত্ত সেই খাদ্যগুলি গ্রহণ করিল।

যাঁহার প্রেমে পশুপক্ষী বশ হয়, তাহাতে মানুষ বশ হইল না। মানুষ সে প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিল না। তাই তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন, "তোমাদের মত ভদ্রবেশধারী আর্য্যসন্তান অপেক্ষা আমার অসভ্য সাঁওতালেরা ভাল লোক।"

ষোল

বোম্বাইয়ের একজন সম্ভ্রান্ত লোক কলিকাতা প্রদর্শন মানসে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধ ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে লইয়া কলিকাতা যাদুঘর দেখাইতে যান। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যরূপে বহুবার ঐ বাটীতে গিয়াছেন, কিন্তু কখনও কেহ তাঁহাকে তাঁহার পাদুকা ত্যাগ করিতে বলে নাই। এইবার কি কারণে বলা যায় না, সেখানকার দ্বারবানেরা তাঁহাকে পাদুকা ত্যাগ করিয়া যাদুঘরে যাইতে বলে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, যাদুঘরে চটিজুতা লইয়া যাইবার নিয়ম নাই। অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া সেই বিদেশী ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন। সঙ্গীটিকে বলিলেন, "আপনাকে অন্য কোনও বন্ধুর সহিত পাঠাইয়া দিব। আমি আর ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব না।"—এই বলিয়া যখন চলিয়া আসেন, তখন যাদুঘরের কর্তৃপক্ষ সাহেব এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বহু সাধ্য সাধনাতেও আর তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। তিনি তখন আর ঐ গৃহে প্রবেশ করিবেন না বলিয়া চলিয়া আসিলেন। কর্তৃপক্ষের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে পর তাঁহারা ক্ষমা প্রার্থনা ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন। তাঁহারা জানাইলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন যে পরিচ্ছদে ইচ্ছা যাদুঘরে ও সোসাইটির আফিসে যাইতে পারিবেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া লিখিয়া পাঠান যে, আমার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম করিবার

প্রয়োজন নাই। সাধারণের জন্য এক নিয়ম এবং আমার জন্য আর এক নিয়ম, এইপ্রকার রীতি-বিপর্য্যয়ের প্রশ্রয় দিতে আমি কোনও মতেই সম্মত নহি। যদি সাধারণের জন্য এইরূপ নিয়ম করা সম্ভব হয়, তবেই কেবল আমি সেই সাধারণ নিয়মের অধীন হইয়া যাতায়াত করিতে পারি, নতুবা বিশেষ নিয়মের সুযোগ লইয়া অপরের সঙ্গে নিজের এইরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করিতে সম্মত নহি। এই কলহে যাদুঘর ও সোসাইটির কর্তৃপক্ষ, তৎপরে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট, ক্রমে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত পত্র লেখালেখি হইয়া শেষে সরকারী জেদ বজায় রহিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধারণের পক্ষ সমর্থনে প্রয়াসী হইয়া যখন বিফলচেষ্ট হইলেন, তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও যাদুঘরের দ্বার অতিক্রম করিবেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এক সময়ে কোনও সম্ভ্রান্ত জমিদার বন্ধুর বাটীর নিকটস্থ এক পূর্ব্বপরিচিত মুদির আহ্বানে তাহার দোকানে পদার্পণ করেন। তাহার মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া দোকানের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একখানি চটের উপর বসিয়া কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে সেই সম্ভ্রান্ত ধনী বন্ধু সুবৃহৎ অশ্ব-যোজিত-শকটে সান্ধ্য-সমীরণ সেবনে বহির্গত হইয়া তদবস্থাপন্ন বিদ্যাসাগর সমীপে রাজপথে উপস্থিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাওয়া যেমন একদিকে অসম্ভব, অপর দিকে সম্ভ্রমশালী লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ স্থানে উপবিষ্ট বিদ্যাসাগরকে সপ্রণাম সম্ভ্রম প্রদর্শনও ততোধিক অপমানজনক। কিন্তু শেষোক্ত অপমানের কার্য্যই ধনীর

সন্তানকে করিতে হইল। পরে এক সময়ে সাক্ষাৎ হওয়াতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "সেদিন বড় বিপদে পড়েছিলে।" প্রত্যুত্তরে বন্ধু বলিলেন, "আপনি পথেঘাটে যেখানে সেখানে ঐরকম বসেন, তাহাতে বড় লজ্জা বোধ হয়।" বীরপুরুষ অমনি বলিলেন, "লজ্জা বোধ হয়? আমার সঙ্গে পরিচয় না রাখিলেই সব চুকিয়া যায়, তোমাকে পথে-ঘাটে অপমানিত হইতে হইবে না। সে ব্যক্তি গরীব বলিয়া কি তোমার অপেক্ষা কম আদরের পাত্র হইবে?

এদেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোকসকল চৈত্র সংক্রান্তিতে দেহের নানা স্থান বিদ্ধ করিয়া সন্ন্যাস যাপন করিত। কেহ কেহ সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিত। ১৮৬৫।৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে এই কুপ্রথা রহিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কু-রীতির নিবারণে বিশেষভাবে গভর্ণমেণ্টের পোষকতা করিয়াছিলেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে সি, আই, ই, উপাধি দ্বারা গভর্ণমেণ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রাজসম্মানে অধিকতর সম্মানিত করেন।

ইহার পর গভর্ণমেণ্ট দেশীয় অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্য হইতে যোগ্যতর ব্যক্তি নির্ব্বাচন পূর্ব্বক "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি দানের ব্যবস্থা করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি দানের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া এই উপাধি গ্রহণে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন।

সতের

নব্য ভারতের পরম গৌরবস্থল বঙ্গজননীর বীরপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনলীলা শেষ হইয়া আসিল। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী দীনময়ী দেবী দুরারোগ্য রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পত্নী-বিয়োগে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। এই ঘটনা তাঁহার প্রাণে এতই প্রবলরূপে আঘাত করিয়াছিল যে, তিনি শারীরিক কি মানসিক কোন শক্তিই পুনরায় যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করিতে পারিলেন না, তাঁহার জীবন ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল।

এইরূপ শোক-জর্জ্জরিত অবস্থায় অল্লাধিক রোগ ভোগ করিতে করিতে কাটাইয়া দিলেন। অনেক সময়ই অনেক দিন শয্যাগত থাকিতেন এবং উপবাস ও বার্লি ভক্ষণ একমাত্র ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ অসুস্থ অবস্থাতেও যখনই একটু ভাল থাকিতেন, তখনই উঠিয়া আপনার বসিবার আসনে বসিতেন এবং যথাসম্ভব কাজকর্ম্মও করিতেন। নিষ্কর্ম্মাভাবে বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

১২৯৭ সালের শেষভাগে তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্বাস্থ্যোন্নতির মানসে শীতের সময়ে ফরাস-ডাঙ্গার বিশ্রাম ভবনে বাস করিতে গেলেন। কিন্তু ফাল্গুন মাসের শেষেই বুঝিলেন যে, তথায় শরীর ভাল হইবার

সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। চিকিৎসায় প্রথম প্রথম কিছু ফল পাইলেও তাহা স্থায়ী হইল না। ক্রমে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই শরীর দুর্ব্বল ও রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে চিকিৎসক ও চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা হইতে লাগিল। নানা প্রকার উপসর্গের মধ্যে হিক্কাই প্রধান। এই হিক্কা ঔষধের গুণে কখনও কমে, কখনও বাড়ে, কিন্তু একেবারে নিবারিত হয় না। ইহার উপর জ্বর অল্প অল্প হইতেছিল, ক্রমে প্রবল হইতে আরম্ভ করিল। জ্বর ও যন্ত্রণার জ্বালায় শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ যায়। ডাক্তার সালজার রোগীর অবস্থা দেখিয়া নিরাশ হইলেন। অন্য কোনও চিকিৎসায় আর কোনও প্রকার ফললাভের আশা নাই দেখিয়া নিজের ব্যবস্থামত যে ঔষধ বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্বে ব্যবহার করিতেন, তাহাই পুনরায় ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। তাহাতে একটু উপকার হইল বটে, কিন্তু বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। ক্রমে আসন্নকালের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে জ্বরের বৃদ্ধি ও যন্ত্রণার হ্রাস হইতে লাগিল।

এইরূপ জীবন-মৃত্যুর দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের মধ্যেও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার সুন্দর জ্ঞান ছিল। যাঁহারা দীর্ঘকাল পরেও দেখা করিতে আসিয়াছে তাহাদিগকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া বসিতে বলিয়াছেন, কোন কোন স্থলে অতি কষ্টে দুই একটি কথাও বলিয়াছেন।

সন ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ বিকালে ও সন্ধ্যার পরেও তাঁহার প্রবল জ্বর ছিল। ১৩ই শ্রাবণের রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটের সময় বঙ্গজননীর ক্রোড় শূন্য করিয়া—রজনীর অন্ধকারে বিষাদ-রাশি ঢালিয়া দিয়া—বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে হাহাকার ধ্বনি তুলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অমরধামে প্রস্থান করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অমর আত্মা ১৩ই শ্রাবণের দ্বিপ্রহরা রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে মর্ত্ত্যধাম পশ্চাতে রাখিয়া অনন্তের পথে অগ্রসর হইল। রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার আয়োজন হইল। পথে তাঁহার চিরপ্রিয় মেট্রপলিটন কলেজের সম্মুখে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কলিকাতার মহাশ্মশান নিমতলার ঘাটে আত্মীয়স্বজনেরা মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গেলেন।

চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে বিদ্যাসাগর-দেহ শায়িত, আর চারিদিকে আত্মীয়স্বজনগণ বিষণ্ণমুখে দণ্ডায়মান।

১৪ই শ্রাবণ প্রাতঃকালে চিতাগ্নি প্রজ্বলিত, ও তৎপরে নির্ব্বাপিত ও চিতাভস্ম বিধৌত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে—বাংলার জেলায় জেলায়—বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে—ভারতের বিভিন্ন দেশের লোকের হৃদয়ে এক মহাশূন্যতার সূচনা হইল। ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র, বালক, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ সকলেই সন্তপ্ত হৃদয়ে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল। সমগ্র ভারতবর্ষ বিষাদপূর্ণ হইল। সমগ্র জনমণ্ডলীর এইরূপ শোকোচ্ছ্বাস ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই।

অযত্নসম্ভূত বনকুসুম যেমন আপনি উঠে, আপনি ফোটে,

বিদ্যাসাগর মহাশয় তদ্রূপ বীরসিংহের গ্রাম্যগৃহে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। দরিদ্র পিতা ঠাকুরদাস অতিকষ্টে তাঁহাকে লালন পালন করিয়া তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অপরিচিত দরিদ্র বালক যৌবনে পদার্পণ করিয়া মানসম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া প্রায়ই ধরাকে সরা জ্ঞান করে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে এরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই। তিনি বহু বিদ্যার আধার হইয়া, প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, প্রচুর ধনসম্পদ ও সম্মানের অধীশ্বর হইয়া একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই যে, তিনি বীরসিংহ নিবাসী দরিদ্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। শৈশবে পর্ণকুটীরে কাল কাটাইয়াছেন, এই কথাটি সর্ব্বদাই গৌরবভরে স্মরণ করিতেন। একাহার ও অনাহারে ছাত্রজীবন যাপন করিতে হইয়াছিল, এ কথার উল্লেখে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। অথচ তাঁহার সময়ে তাঁহার অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত লোক অতি অল্পই ছিল।

আমরা আজ যে বাংলা ভাষা পাঠ করি এবং যাহার আলোচনায় তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকি, ইহার জন্য আমরা তাঁহারই নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তিনি এবং অক্ষয়কুমার দত্ত বর্ত্তমান বাংলা ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহারা উভয়েই বাংলা সাহিত্যের যেরূপ পরিচর্য্যা করিয়াছেন, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে বাংলা সাহিত্যের এইরূপ ত্বরিত পদে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া বহু বিলম্বসাধ্য হইয়া পড়িত।

একদিন কয়েক ঘণ্টার পরিশ্রমের ফলে 'উপক্রমণিকা' রচিত হইয়াছিল। উপক্রমণিকায় তাঁহার বিশেষত্বের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বেতালপঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা ও সীতার বনবাস যে লেখনীর গৌরব সাধন করিয়াছে, সেই লেখনীর বিশেষত্ব এই যে, তাহাই সুকুমারমতি শিশুগণের পাঠোপযোগী সরল গ্রন্থ সকলের জনয়িত্রী। আবার সেই লেখনী হইতেই বর্ণমালা ও সহজ শব্দবিন্যাসের পরিচয়স্থল বর্ণ-পরিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাও আবার বিদ্যালয় পরিদর্শন উপলক্ষে পাল্কীতে যাইতে যাইতে পথে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রচিত হইয়াছিল।

যে ভুবনবিজয়ী কার্য্যকলাপের ভারে সমগ্র ভারতবাসী তাঁহার সমক্ষে নতমস্তক, সে সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে তিনি সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিচয় প্রদানে অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহারও ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি তাঁহার কিশোরবয়স্ক ছাত্রজীবনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। বালক ঈশ্বরচন্দ্র বালিকা আত্মীয়াদিগের বৈধব্য ও তন্নিবন্ধন বিবিধ দুঃখকষ্টের চিত্র দর্শনে ক্রমে নারীসুহৃদরূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দরিদ্রের গৃহে নানা প্রকার অভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া জনসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হওয়া এবং চিরদিন দীনজনের সুহৃদ্‌রূপে জীবন যাপন করিয়া যাওয়া পুরুষ শক্তিবিশিষ্ট মহাত্মা ব্যক্তির কার্য্য। তিনি বিদ্যালয়ে আদর্শ বালক রূপে, কর্ম্মস্থানে নিষ্ঠাবান্ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীর আদর্শরূপে, বাংলা সাহিত্যে সরল, মার্জ্জিত ও

শ্রুতিমধুর গদ্য রচনার পথপ্রদর্শকরূপে আমাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান। সমাজসংস্কারক্ষেত্রে আজ তাঁহার স্থান অধিকার করিবার কেহই নাই।

তিনিই তাঁহার কার্য্যকলাপের একমাত্র তুলনাস্থল। তাঁহার অন্য তুলনা মিলে না।

মানবপ্রেম তিনি যেমন অনুভব করিয়াছিলেন, মানুষকে তিনি যেমন অকৃত্রিম স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, সেরূপ স্নেহের দৃষ্টিতে মানুষকে অতি অল্প লোকেই দেখিতে শিখে। দ্বাদশ বর্ষীয় বালক বিদ্যাসাগর নিজে নানা প্রকার দুঃখকষ্টের মধ্যে থাকিয়াও বৃত্তির টাকায় পরসেবার সূত্রপাত করিয়াছিলেন।

পরোপকারে তাঁহার আত্মপর, স্বজাতি ও ভিন্নজাতি, স্বদেশী ও বিদেশী, স্ত্রী পুরুষ এই সকলের বিচার ছিল না। মানবমাত্রেই তাঁহার ভালবাসার পাত্র ছিল। গৃহস্থের প্রয়োজনে গোবৎস মাতৃদুগ্ধপানে বাধা পাইতেছে দেখিয়া যে মহাত্মা দীর্ঘকাল দুগ্ধপানে বিরত ছিলেন তাঁহার হৃদয় যে কত কোমল তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি কি না সন্দেহ! তাই বলি, তাঁহার লোকহিতৈষণা ও জীবে দয়ার অন্য তুলনা মিলে না,—তিনিই তাহার তুলনাস্থল।

সমাপ্ত